নানা

এমিল জোলা

নানা

ঃ রচনা ঃ

এমিল জোলা

ঃ অনুবাদ ঃ

শ্রীইন্দুভূষণ দাস

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম ঃ তিন টাকা

মুদ্রক
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পান
নিউ সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

অগ্রজপ্রতিম

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

করকমলে

ইন্দুভূষণ

গ্রন্থকার পরিচিতি

বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক এমিল জোলার নাম আজ এদেশে অপরিচিত নয়। শুধু এদেশে কেন, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই আজ এমিল জোলার নাম সুপরিচিত। ফ্রান্সের প্যারী নগরীতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এমিল জোলা জন্মগ্রহণ করেন। খুব অল্প বয়স থেকেই জোলা লিখতে আরম্ভ করেন। এমন কি তাঁর প্রথম বই "Contes a Ninon"-ও সেকালে খুবই নাম করেছিল। অবশ্য প্রথম বই লিখেই তিনি বিখ্যাত হন নি। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ থেকে যখন তাঁর লেখা "L'Assommoir" প্রকাশিত হয়।

এর পরেই প্রকাশিত হয় "নানা" ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। নানা বইখানা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা প্যারী নগরীর অভিজাত মহল প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। কিন্তু অভিজাত মহলের এই তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও 'নানা' অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নানার প্রথম সংস্করণের ৫০,০০০ কপি শেষ হতে লাগে মাত্র কয়েক দিন। বই খানির এই রকম অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখে আরও দশ হাজার কপি ছাপা হয় কিছুদিনের মধ্যেই।

কিন্তু বিক্রির দিক দিয়ে জোলার বইগুলো অসম্ভব সাফল্য অর্জন করলেও প্যারীর অভিজাত মহল জোলাকে নর্দমা-ঘাঁটা কীট পর্য্যন্ত বলতে ছাড়েন নি। অনেকে এমন কথাও বলতেন যে জোলার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই নাকি নানার মত বই তিনি লিখেছেন, না হলে যণ্ডিকালয়ের ওরকম হুবহু বর্ণনা তিনি কি করে লিখলেন। কিন্তু শত্রুপক্ষ যাই বলুক না কেন, চরিত্রের দিক থেকে জোলা ছিলেন আদর্শ স্থানীয়।

আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, সাহিত্যিক সম্মান লাভ করেন মারা যাওয়ার পরে। এমিল জোলার ভাগ্যেও অনেকটা সেই রকমই

হয়েছিল। ক্যাপ্টেন ড্রেফাস-এর মামলায় তদানিন্তন সামরিক কর্তৃপক্ষকে তিনি যেভাবে সরাসরি আক্রমণ করে তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ "I accuse" রচনা করেন আর তারই ফলে ক্যাপ্টেন ড্রেফাস মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন ড্রেফাস মুক্তি পেলেও জোলার উপরে পড়লো রাজরোষ। সামরিক বিভাগের গোপন তথ্য ফাঁস করে দেবার মিথ্যা অভিযোগে উক্ত ক্যাপ্টেনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এই মিথ্যাকে খণ্ডন করেই রচিত হয় জোলার সুবিখ্যাত পত্র "I accuse"। কিন্তু ক্যাপ্টেনকে রক্ষা করতে গিয়ে জোলাকে পালিয়ে যেতে হয় লণ্ডনে।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে এই বিখ্যাত সাহিত্যিকের জীবনাবসান হয় প্যারীর এক অখ্যাত বাড়ীর অন্ধকারময় ঘরে। জানা যায় যে কাঠকয়লার ধোঁয়া থেকে উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের ক্রিয়াতেই তাঁর মৃত্যু হয়। জোলার মৃতদেহ সমাহিত করা হয় অতি সাধারণ ভাবেই। অবশেষে তাঁর মৃত্যুর পর যখন কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারেন যে একমাত্র এমিল জোলার কৃতিত্বেই ক্যাপ্টেন ড্রেফাস-এর জীবন রক্ষা হয়েছে, তখন তাঁর মৃতদেহের কঙ্কালটি কবর থেকে তুলে নিয়ে সামরিক সম্মানের সঙ্গে আর একবার সমাহিত করা হয়।

এ যেন :— "জীবনে যারে কভু দাওনি মালা,
মরণে তারেই তুমি দিতে এলে ফুল।"

এক

ভ্যারাইটি থিয়েটার। পৌরাণিক নাটক 'ব্লণ্ডি ভেনাস'-এর শুভ উদ্বোধন-রজনী। সারা 'প্যারী' উন্মুখ হয়ে ছিল এই রাতটির জন্যই।

রাত তখন প্রায় ন'টা। প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে কথা হচ্ছিলো দুজন যুবকের মধ্যে। যুবক দুজনের একজন হচ্ছে রঙ্গালয়-সম্পর্কিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ফিগারো'-সম্পাদক মঁসিয়ে ফুচেরি আর একজন তারই মাসতুতো ভাই—নাম হেক্তর-দ্য-লা ফ্যালিজ। হেক্তর আবার 'ফিগারো'-পত্রিকার প্রিণ্টার-পাবলিশারও বটে।

ফুচেরিই কথা বললো আগে।

সে বললো—কি হে ব্রাদার! তোমাকে না বলেছিলাম যে, থিয়েটার আরম্ভ হতে দেরি হবে। দেখলে তো?

—তাই তো দেখছি। বিজ্ঞাপনের ঘটা দেখে তো মনে হয়েছিল যে, রাত ন' টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি অভিনয় আরম্ভ হয়ে যাবে। প্যারীর থিয়েটার-গুলো দেখছি সময়ানুবর্তিতার ধারও ধারে না।

—ও ব্যাপারে কেবল থিয়েটারগুলোকেই দোষ দিলে চলবে কেন? আমাদের স্বভাবই হ'য়ে পড়েছে সময়-মত কোন কাজ না করা। এই কথা বলবার পর একটু থেমে ফুচেরি আবার বললো—কিন্তু এই ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে না থেকে চলো বরং বাইরে গিয়ে দেখা যাক, কি রকম লোকজন আসছে।

—তা মন্দ বলোনি কথাটা! চলো, বাইরেই যাওয়া যাক।

ওরা তখন বাইরে যাবার জন্য দরজার দিকে মুখ ফেরাতেই থিয়েটারের একজন গার্ডকে ওদের দিকে আসতে দেখা গেল।

গার্ড লোকটি ফুচেরিকে চিনতো, তাই সে অতি বিনয়ের ভঙ্গীতে তাকে অভিবাদন করে বললো—নমস্কার সম্পাদক মশাই, তা আজ যে বড় সকাল সকাল ? অভিনয় আরম্ভ হ'তে এখনও তো কমসে কম আধ ঘণ্টা দেরি।

ফুচেরি গার্ডের সামনে তার সম্পাদকসুলভ গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললো—হ্যাঁ, একটু সকাল করেই আসা গেল আজ। কিন্তু, তোমাদের ম্যানেজার সাহেব কোথায় ? তাকে তো দেখতে পাচ্ছি নে ?

গার্ড বললো—তিনি বোধ হয় বক্স অফিসে আছেন, ডেকে দেবো ?

ফুচেরি বললো—না, ডাকতে হবে না, আমরাই যাচ্ছি বাইরে।

গার্ডটি তখন আর একবার সম্পাদক মশাইকে অভিবাদন করে চলে গেল ওখান থেকে।

গার্ড চলে যেতেই ওরাও বাইরের দিকে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

চলতে চলতেই হেক্তর জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা, 'নানা' নামে যে নতুন অভিনেত্রীটি নামছে আজ, তাকে তুমি দেখেছো ?

ফুচেরি বললো—কি বিপদ! তোমার মুখেও ঐ 'নানা'! প্যারী'র লোকদের মুখে কি আজ ঐ 'নানা' ছাড়া কোন প্রশ্নই নেই ?

—তার মানে ?

—মানে আবার কি! আজ সকাল থেকে অন্ততঃ বিশ জন লোক আমাকে জিজ্ঞেস করেছে—নানা কে ? নানার বয়স কত ? নানাকে দেখতে কেমন ? এই সব। কেন রে বাপু! আমি কি মেয়েমানুষের দালালি করি নাকি ? কোথাকার কোন্ নানা কি করলো না করলো, সে খবরও কি আমাকে রাখতে হবে নাকি ?

—না, তা বলছি না। সবার মুখেই আজ ঐ নানার নাম কিনা! তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

—তা যা বলেছো! ভ্যারাইটির ম্যানেজারটি দেখছি একটি বাস্তু-ঘুঘু। কোথাকার কোন্ বস্তির মেয়েমানুষকে ধরে এনে অ্যায়সা 'পাবলিসিটি' সুরু

করেছে, যাতে সবাই মনে করছে যে, 'নানা' যেন একটা ডানা-কাটা পরী-টরী-গোছের একটা কিছু। আরে! ঐ যে আমাদের ম্যানেজার সাহেব! হাল্লো বোর্দেনেভ্! ওদিকে কোথায় চলেছো?

ফুচেরির ডাক শুনে ম্যানেজার তার দিকে তাকিয়েই সোৎসাহে বলে উঠলো—আরে! সম্পাদক ব্রাদার যে! কখন এলে?

—এই তো কিছুক্ষণ। তারপর?

—তারপর মানে? তোমার সঙ্গে আজ আমার একহাত হ'য়ে যাবে। 'নানা'র সম্বন্ধে তোমার কাগজে কিছুই তো লেখোনি দেখলাম!

—দুত্তোর নানা! কে তোমার নানা, না দেখেই আমি লিখি আর কি! 'ফিগারো'র লেখা অতো সস্তা নয় বন্ধু! আগে আমি তোমার নানাকে দেখবো, তারপর বিবেচনা করবো তার সম্বন্ধে কিছু লেখা চলে কি না?

এই সময় হঠাৎ হেক্তরের দিকে নজর পড়ায় ফুচেরির মনে পড়লো যে, এখনও তাকে ম্যানেজারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় নি। তাই সে নানা'র প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বললো—আরে এসো হেক্তর, ম্যানেজার ভায়ার সঙ্গে তোমার পরিচয়টা করিয়ে দিই।—ইনি হচ্ছেন হেক্তর-দ্য-লা ফ্যালিজ, আমার মাসতুতো ভাই, প্যারীতে এসেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে—আর ইনি, আমার বন্ধু মঁসিয়ে বোর্দেনেভ্—ভ্যারাইটি থিয়েটারের ম্যানেজার।

হেক্তরের টাকাতেই যে 'ফিগারো' চলে এবং সে-ই যে 'ফিগারো'র প্রিণ্টার-পাবলিশার, সে কথাটা একদম চেপে গেল ফুচেরি।

পরিচয়ের পরে একটা কিছু বলা দরকার মনে করে হেক্তর বললো—আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই আনন্দ লাভ করলাম। আপনার থিয়েটার···

ম্যানেজার তাড়াতাড়ি হেকতরের কথায় বাধা দিয়ে বললো—আমার খানকী-বাড়ী বলুন!

ম্যানেজারের কথায় ফুচেরি একেবারে হো হো করে হেসে উঠে বললো—বড় দামী কথা বলেছো ব্রাদার!

ম্যানেজারের মুখে তার থিয়েটারের এই সরল ব্যাখ্যা শুনে হেকৃতর একেবারে থ' হয়ে গেল। থিয়েটারের একজন ম্যানেজার যে তার নিজের থিয়েটার সম্বন্ধে ঐ রকম হীন মন্তব্য করতে পারে, এ ধারণাও ছিল না তার। তাই একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললো—আমি শুনেছি যে নানার কণ্ঠ নাকি কোকিলের মত ?

—কাকের মতও বলতে পারেন !

—আর, সে নাকি চমৎকার অভিনয় করে ?

—অভিনয় ! স্টেজে দাঁড়াতেই শেখেনি এখনও, তার আবার অভিনয় !

ম্যানেজারের এই কথায় ফুচেরি হঠাৎ বলে উঠলো—বলছো কি ব্রাদার ! তোমার নানা যদি গান বা অভিনয় কিছুই করতে না পারে, তা হলে তার পেছনে অতো টাকা ঢেলে 'পাবলিসিটি' চালাবার অর্থ ?

—কি আশ্চর্য্য ! তুমিও শেষে এই কথা বললে ! নানার গলা কাকের মতই হোক বা সে অভিনয় করতে একেবারেই অক্ষম হোক, তাতে কিচ্ছু আসবে যাবে না। আসলে যা চায় প্যারীর মানুষরা, সেই জিনিসটিই যে আছে ওর। নানার দেহে আছে অফুরন্ত যৌবন আর চোখ-ধাঁধানো রূপ। ঐ চালেই আমি মাত করে দেবো, এ তুমি দেখে নিও।

—তাই নাকি ! তা এমন 'উমদা চীজ'টি কোত্থেকে জোগাড় করলে বলো তো ?

—সে কথা জেনে তোমার কি লাভ ? আরে ! এই যে আমার চাঁদ-বদনী এসে গেছে ! কি রোজী, এত দেরি ?

রোজী ওরফে রোজ মিগনন এই থিয়েটারেরই একজন অভিনেত্রী। বয়স একটু হলেও 'মেক-আপ'-এ মেরে দেয় সে। তা ছাড়া বড় বড় এবং 'ক্রিটিক্যাল পার্ট' যা কিছু—সবই করতে হয় রোজীকে। তাই থিয়েটারে তার খাতিরটাও একটু বেশী।

মিষ্টি হাসি হেসে রোজী বললো—আমি এক্ষুনি 'রেডি' হয়ে নিচ্ছি।

এই কথা বলেই অভিনেত্রীদের দরজার দিকে চলে গেল সে। বলতে ভুলে গেছি, রোজী একা আসেনি; তার সঙ্গে এসেছে প্যারীর একজন নামকরা 'ব্যাঙ্কার'—মঁসিয়ে ষ্টিনার।

এই ষ্টিনার লোকটা ছিল জাতিতে ইহুদী। মহাজনি কারবার করে এবং মক্কেল লোক দেখে চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে মোটা রকম দাঁও মারতো সে। কিন্তু টাকা রোজগার করলে কি হয়! সব টাকাই সে ফুঁকে দিত মদ আর মেয়েমানুষের পেছনে। থিয়েটারের অভিনেত্রীদের উপরেই তার ঝোঁক ছিল বেশী। কোন নূতন অভিনেত্রী নামছে শুনলেই ষ্টিনার যেন ক্ষেপে উঠতো তাকে হাত করতে।

ষ্টিনারের চেহারাখানা কিন্তু ঠিক বুনো শূয়োরের মত। এ হেন ষ্টিনারের বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে রোজী চলে যেতেই ষ্টিনার ম্যানেজারের কাছে এসে বললো—এই যে ম্যানেজার সাহেব! কেমন আছেন বলুন?

—আমাদের আবার থাকা আর না থাকা! আমরা তো আপনাদের মত মহাত্মা লোকদের জন্যই গুদাম খুলে বসে আছি।

—হেঁ হেঁ, কি যে বলেন আপনি! হ্যাঁ ভাল কথা! শুনলাম একটি নতুন মাল নাকি আমদানি হয়েছে?

—কে? নানা? এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে সে খবর আপনার কাছে? একটু থেমে ম্যানেজার আবার বললো—তা নানার খবর তো রাখবেনই আপনি! রতনেই রতন চেনে কিনা?

ম্যানেজারকে আর বেশী কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে ষ্টিনার কেটে পড়লো ওখান থেকে।

সে চলে যেতেই ফুচেরি টিপ্পনি কাটলো—ব্যাটার দেখছি বুড়ো কালে ধেড়ে রোগে ধরেছে! দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা কেবল মেয়েমানুষের খোঁজ নিয়ে বেড়াচ্ছে!

—পকেটে রেস্ত থাকলে ওরকম অনেকেই বেড়ায়! বচন ঝাড়লো হেক্‌তর। হঠাৎ রাস্তার দিকে নজর পড়তেই হেকতর দেখলো যে, বিগতযৌবনা এক রূপসী গাড়ী থেকে নামছে। মেয়েছেলেটিকে চেনা-চেনা মনে হ'ল তার। সম্পাদকের দিকে তাকিয়ে সে বললো—দ্যাখো তো ব্রাদার, লুসি কি না ?

ফ্রুচেরি বললো—হ্যাঁ। কেন বলো তো ?

—না, এমনিই জিজ্ঞেস করছি। ওর বক্স-এর টিকিট তুমিই জোগাড় করে দিয়েছো কিনা, তাই···

লুসি বলে যাকে বলা হ'ল, সেই মেয়েছেলেটির বয়স হয়েছিল। কিন্তু বয়স হলে কি হয়, মক্কেল বধ করতে ওর মত ওস্তাদ মেয়ে কমই আছে। বয়স ওর প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। চেহারাও এমন কিছু 'মার-মার' নয়, কিন্তু ওর চাউনিতে, চলনে, বলনে—সবেতেই এমন একটা চটুল চপল ভাব আছে যে, পুরুষমানুষরা পতঙ্গের মত এসে জোটে ওর চারপাশে।

লুসির সঙ্গে আরও একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটির নাম ক্যারোলিন হিকেত্। দেখতে সুন্দরীই বলা চলে তাকে। কিন্তু সুন্দরী হলেও তার সে সৌন্দর্যে দাহিকা শক্তির অভাব ছিল।

ফ্রুচেরিকে দেখতে পেয়ে লুসি এগিয়ে এসে বললো—এই যে বন্ধু! তুমি আমাদের বক্সেই বসবে তো ?

ফ্রুচেরি বললো—না। বক্স থেকে ভাল দেখতে পাওয়া যায় না। আমি স্টলেই বসবো।

লুসি যেন একটু বিরক্ত হলো ফ্রুচেরির প্রত্যাখ্যানে। একটু চুপ করে থেকে সে হঠাৎ বলে বসলো—তুমি ডুবে ডুবে জল খেতে সুরু করেছো কতদিন থেকে ?

—তার মানে ?

—মানে, নানার সঙ্গে যে তোমার পরিচয় আছে, সে কথা আগে বলোনি কেন ?

—নানার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে! বলছো কি তুমি! আমি যে এখনও দেখিই নি তাকে!

এই সময় আর একটি মেয়েছেলেকে আসতে দেখে লুসি বললো—এই যে ব্লান্সি আসছে! ঐ ব্লান্সিই তো আমাকে বলেছে যে, নানার বাড়ীতে তোমার রীতিমত আনাগোনা আছে! বলো তো তোমার সামনেই ডেকে জিজ্ঞেস করছি ওকে।

ফ্চেরি বললো—থাক্ আর কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে হবে না। তোমাদের কি কেবল ঐ কথা ছাড়া আর কোন কথাই থাকতে নেই নাকি?

ব্লান্সি বলে যাকে বলা হ'ল, সে মেয়েটিও একটা বড় রকমের শিকারী। ওর শিকারের বেশির ভাগই বড় বড় রুই-কাত্‌লা। আজও তার সঙ্গে যে লোকটি এসেছে, তাকে দেখে মোটা মক্কেল বলেই মনে হ'লো ওদের।

ফ্চেরি চুপি চুপি হেক্তরকে জিজ্ঞাসা করলো—ব্লান্সির সঙ্গের ঐ মক্কেলটিকে চেনো?

হেক্তর বললো—না তো!

ফ্চেরি বললো—তবে শোনো। ওর নাম হচ্ছে কাউণ্ট জেভিয়ার-ছ-ভাঁদেভো!

কাউণ্টের বাহুলগ্না হয়ে ব্লান্সি ভিতরে চলে গেল। ব্লান্সির পেছনে পেছনে লুসিও চলে গেল ওখান থেকে।

এই সময় ধোপদোরস্ত পোশাক পরা-সুন্দর চেহারার একজন যুবককে দেখতে পাওয়া গেল ভিড়ের মধ্যে। কে একজন টিপ্পনি কেটে উঠলো—"ঐ দ্যাখো নানার পীরিতের নাগর!"

যুবকটির নাম ড্যাগনেট।

এই বয়সেই মদ আর মেয়েমানুষের পেছনে বার্ষিক সাড়ে চার হাজার ফ্রাঙ্ক আয়ের সম্পত্তি ফুঁকে দিয়ে কাপ্তেনের খাতায় নাম লিখিয়েছে সে।

এদিকে টিকিট-বিক্রির জানালার সামনে তখন রীতিমত ভিড় জমে উঠেছে। সবাই ব্যস্ত আগে টিকিট কিনতে।

থিয়েটার আরম্ভ হবার ঘণ্টা বেজে উঠলো। হেক্তর ফুচেরিকে একরকম টানতে টানতে ভিড় ঠেলে প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে ঢুকে পড়লো। স্টেজের সামনের আলোগুলো জ্বলে উঠেছিল তখন। অডিটোরিয়াম ভরতি হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপার দেখে 'একস্ট্রা সীট'-এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সারা প্যারী শহরের শৌখিন সম্প্রদায় আজ ভেঙে পড়েছে ভ্যারাইটি থিয়েটারে। ধনী, বিলাসী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, অব্যবসায়ী সবাই। হেক্তর আশ্চর্যান্বিত হয়ে লক্ষ্য করছিল এই অভূতপূর্ব জনসমাবেশ। হঠাৎ একটা বক্সে একজন মহামান্যবর লোককে দেখে হাত তুলে অভিবাদন জানালো সে।

ফুচেরি আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—কাউণ্ট মাফাত্-এর সঙ্গে তোমার চেনা আছে নাকি?

—নিশ্চয়ই। ওঁকে তো আমি ছেলেবেলা থেকে চিনি। আমাদের বাড়ীর কাছেই যে ওঁর জমিদারি! ওঁর বাড়ীতে তো আমি প্রায়ই যাই।

ফুচেরি লক্ষ্য করলো যে, কাউণ্টের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী কাউণ্টেস স্যাবাইন আর তাঁর শ্বশুর 'মার্কুইস-দ্য-কুয়ার্দ'ও আছেন।

বুড়ো মার্কুইসের রাজদরবারে বিশেষ প্রতিষ্ঠা আছে, সে-কথা ভাল করেই জানতো ফুচেরি। এই রকম জাঁদরেল লোকদের সঙ্গে চেনা-পরিচয় থাকলে অনেক কিছু স্থবিধে হয়, এই বিবেচনায় সে বললো—আমাকে কাউণ্ট-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও না?

হেক্তর বললো—বেশ তো! অঙ্ক শেষ হলেই তোমাকে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করে দোবো 'খন।

কাউণ্টের সঙ্গে পরিচয় করবার আরও আগ্রহ হয় সম্পাদকের—কাউণ্টেসকে দেখে। কাউণ্টেস-এর চেহারার ভিতরে এমন কিছু দেখতে পায় সে, যাতে তার মনে হয় যে, ওখানে টোপ ফেললে কাজ হওয়া সম্ভব!

ঐকতান বাজনা থেমে গেল।

প্রেক্ষাগৃহের মৃদু গুঞ্জনধ্বনি স্তিমিত হয়ে এলো।

সামনের পর্দাটা সরে গেল।

ইয়োরোপীয় পৌরাণিক নাটক 'ব্লণ্ডি-ভেনাস'-এর অভিনয় সুরু হয়ে গেল।

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে 'আইরিশ ও গেণিমিদ্'-এর প্রবেশ।

অভিনয় চললো।

কিন্তু নানা কোথায়?

নানা কখন আসবে?

কার পার্ট করছে নানা?

ডায়না-বেশে রোজ মিগনন প্রবেশ করলো।

এর পর আসতে লাগলো আরও অনেক পাত্র-পাত্রী। সবাই যে যার মুখস্থ-করা পার্ট প্লে করে যাচ্ছে।

মার্স-এর সঙ্গে ডায়নার দাম্পত্য কলহ—

অভিযোগ,

প্রত্যভিযোগ,

অবশেষে পুনর্মিলন।

মার্স-এর পার্ট প্লে করছিল নটভাস্কর প্রুলিয়ার।

কিন্তু নানা কোথায়?

ম্যানেজার ব্যাটাচ্ছেলে কি বিজ্ঞাপনের ভাঁওতা দিয়েছে নাকি?

হঠাৎ স্টেজের উপরের কৃত্রিম মেঘরাশি সরে গেল।

ভেনাস-এর প্রবেশ।

নানা !!!

এই নানা?

আনন্দে শিস দিয়ে উঠ্লো নীচের শ্রেণীর দর্শকের দল।

বাজনা বেজে উঠলো।

ভেনাসের গান—"সাঁঝের আকাশে আমি সন্ধ্যাতারা—"

কিন্তু একি বিশ্রী গলা ?

আরে ছিঃ ছিঃ—এ যে একেবারেই যা-তা !

বিশ্রী বেসুরো শোনালো নানার গান।

গান শেষ হলো।

কিন্তু কোথায় দর্শকদের হাততালি ?

কোথায় অভিনন্দন ?

অভিনন্দনের পরিবর্তে হেসে উঠলো দর্শকের দল।

দর্শকদের হাসতে দেখে নানাও হেসে উঠ্‌লো।

হাসতে গিয়ে তার সুন্দর গালে টোল খেলো।

মুক্তার মত সুন্দর দাঁতগুলি !

কি সুন্দর ঠোঁট দুখানি !

স্বল্প পোশাকের আস্তরণ ভেদ করে উচ্ছল যৌবনের কি দীপ্তিময়ী শোভা !

মোহাবিষ্ট হয়ে পড়লো দর্শকের দল।

"মাইরী কি চীজ রে !" চীৎকার করে উঠলো কোন বকাটে দর্শক।

আর যায় কোথায় ! হাততালি, শিস, চীৎকার।

নানা লাভ করলো সহস্র দর্শকের অভিনন্দন।

প্রথম অঙ্ক শেষ হলো।

দলে দলে দর্শকদল দরজা দিয়ে বের হতে লাগলো।

সবার মুখেই তখন একটি মাত্র কথা—'নানা' !

হট্টগোলের মধ্যে ফুচেরি লক্ষ্য করলো যে, কাউন্ট মাফাত্‌ এবং কাউণ্টেস-ও তখন দাঁড়িয়ে উঠেছেন।

হেক্‌তরের হাতে একটা টান মেরে ফুচেরি বললো—কৈ হে ব্রাদার ? কাউন্ট-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে বলছিলে যে ?

—ওঃ হো! ভুলেই গিয়েছিলাম। চলো, এখনই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

ফুচেরিকে সঙ্গে নিয়ে ভিড় ঠেলে কাউণ্টের বক্সের কাছে এগিয়ে গিয়ে হেকৃতর বললো—আপনিও এসেছেন দেখছি স্যর?

কাউণ্ট বললেন—আরে! হেকৃতর যে! ভাল তো?

—হ্যাঁ স্যর ভালই আছি। আমি এলাম আপনার সঙ্গে আমার এই ভা…মানে বন্ধুটির পরিচয় করিয়ে দিতে। মঁসিয়ে ফুচেরি—সম্পাদক, 'ফিগারো' পত্রিকা—কাউণ্টেস অ্যাণ্ড কাউণ্ট মাফাত্-দ্য-বোভাইল।

"আজ আমার কি সৌভাগ্য" বলে হাত বাড়িয়ে দিল ফুচেরি।

কাউণ্টেস এবং কাউণ্ট দুজনের সঙ্গেই করমর্দন করলো সে।

"কি নরম হাতখানা কাউণ্টেসের!"

"মুখখানাও বেশ।"

"গালের উপরে একটা কালো তিল।"

মনে মনে খুশী হলো ফুচেরি।

কাউণ্টের শ্বশুর বুড়ো মার্কুইস-এর সঙ্গেও পরিচয় হলো ফুচেরির।

কাউণ্টেস তো একেবারে নিমন্ত্রণই করে বসলেন সম্পাদক মশাইকে।

ওদিকে ফুচেরির অবসর-সঙ্গিনী লুসি দূর থেকে আড় চোখে তার পিরীতের নাগরের এই কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করছিল, আর মনে মনে কাউণ্টেসের নিপাত কামনা করছিল।

আর এক কোণে দেখা গেল, মিগননকে সঙ্গে নিয়ে কি সব বলতে বলতে সুদখোর ষ্টিনার বাইরের দিকে যাচ্ছে। ষ্টিনার জানতো যে, মিগনন লোকটাকে দিয়ে অনেক কাজ হয়। তার নিজের স্ত্রী রোজ মিগননের জন্যও মক্কেল জোটাতো সে। ষ্টিনারের সঙ্গে রোজ মিগননকে তো বলতে গেলে সে-ই জুটিয়ে দিয়েছিল।

মেয়েমানুষের দালালি করাই ছিল মিগননের ব্যবসা।

থিয়েটার-সংলগ্ন কাফিখানার এক কোণের টেবিলে ষ্টিনারকে নিয়ে বসে মিগনন চুপি চুপি বললো—কি হে ব্যাঙ্কার? দেখবো চেষ্টা?

—তা দেখতে পারো। কিন্তু পারবে কি?

—পারবো না মানে? নানা তো নানা, বলোতো নানার দিদিমাকে পর্যন্ত জুটিয়ে দিচ্ছি।

—রক্ষে করো ভাই! নানার দিদিমাকে আমার দরকার নেই। নানাকে পেলেই চলবে।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে মিগনন বললো—কিন্তু দেখো ব্রাদার! আমার বউ যেন টের না পায় যে, আমি তোমাকে নানার সঙ্গে জুটিয়ে দিয়েছি।

ষ্টিনার বললো—পাগল! এসব কথা আমি কি বলতে পারি?

এমনিভাবে নানা জায়গায় নানা লোকের মুখে ঐ একই আলোচনা—'নানা' আর 'নানা!'

অভিনয় শেষ হলো।

দর্শকের দল চলে যেতে লাগলো।

কাউন্ট-ভ্য-ভাঁদেভোকে দেখা গেল ব্লান্সির হাত ধরে গাড়ীতে উঠতে।

ড্যাগনেট কোন ফাঁকে আগেই কেটে পড়েছিল। আঠারো-উনিশ বছর বয়সের স্কুলের এক ছোকরাকে দেখা গেল অভিনেত্রীদের দরজার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে।

কাউন্ট মাফাত, তাঁর স্ত্রী আর শ্বশুরকে নিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ীতে উঠে বসলেন।

বেচারা সম্পাদক!

ইচ্ছে থাকলেও কাউণ্টেসকে বিদায়-অভিনন্দন জানাবার উপায় নেই তার। সে তখন লুসির বাহু-বন্ধনে বন্দী।

ম্যানেজার এসে ফুচেরিকে ধরে পড়লো—আগামী সংখ্যা 'ফিগারো'তে নানার সম্বন্ধে একটু ভাল করে লিখবে তো?

মৃদু হেসে ফুচেরি বললো—দেখি কি করা যায়!

সে রাত্রের মত থিয়েটার বন্ধ হলো!

দুই

থিয়েটারের পরদিন।

বেলা ন'টা বেজে গেল, কিন্তু নানা তখনও বিছানায় পড়ে ঘুমুচ্ছে। প্যারীর বুলভার্দ হাউসম্যান পল্লীর একখানি নূতন বাড়ীর সম্পূর্ণ দোতলাটা ভাড়া নিয়েছিল নানা। বাড়ীটা অবশ্য নানা নিজের টাকায় ভাড়া করেনি। কিছুদিন আগে এক রাশিয়ান মক্কেল জুটেছিল তার, বাড়ীটা সে-ই ভাড়া করে দিয়েছিল।

দোতলায় ঘর ছিল অনেকগুলো।

কিন্তু ঘর বেশি থাকলে কি হয়, নানার বাড়ী যেন ছিল বিশৃঙ্খলার রাজত্ব। আসবাবপত্র যে ছিলনা তা নয়, কিন্তু সেগুলো দেখলে নানার রুচিজ্ঞানের দৈন্যই প্রকটিত হতো। খুব হীন অবস্থার কোন লোক হঠাৎ টাকা পেলে যেমন যা খুশি কেনে, নানার বাড়ীর আসবাবপত্র দেখলেও অনেকটা সেইরকম মনে হতো।

অন্যান্য ঘর থেকে নানার শোবার ঘর আর বসবার ঘর দুটো কিছুটা ভাল করে সাজানো।

জানালা দিয়ে রোদ এসে বিছানায় ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু নানা তখনও ঘুমিয়ে।

দুহাত দিয়ে মাথার বালিশটাকে জড়িয়ে ধরে উপুড় হয়ে ঘুমুচ্ছিল সে।

কিছুক্ষণ পরে ঘুম ভাঙলো নানার। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজলো সে একবার, কিন্তু কাউকে না দেখতে পেয়ে ঘুম-জড়ানো চোখেই খাটের পাশের কলিং বেলটা টিপে ধরলো।

কলিং বেলের আওয়াজ হতেই জো এসে ঢুকলো সেই ঘরে। জো নানার পরিচারিকা।

—সে গেছে? জিজ্ঞেস করলো নানা।

জো বললো—কার কথা বলছো দিদিমণি? মঁসিয়ে পল?—সে তো অনেকক্ষণ চলে গেছে। তুমি ঘুমোচ্ছো দেখে আর জাগালুম না তোমাকে। কাল আসবে বলে গেছে সে।

—কাল আসবে! এই রে—সেরেছে! কাল যে ব্ল্যাকমুরের আসবার কথা আছে! ওরা দুটোতে এক সঙ্গে এলেই হয়েছে আর কি!

একটু চিন্তা করে নানা বললো—কথাটা তোকে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম যে, কাল ব্ল্যাকমুরের সঙ্গে 'এন্‌গেজমেণ্ট' করা হয়েছে। আমি আজই ঐ কিপ্‌টে বুড়োকে চিঠি লিখে দিচ্ছি, যাতে কাল সে না আসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি আসে, তাহলে ওকে ঘরে ঢুকতে দিবিনি, বুঝলি? যাক্‌গে, আর কেউ এসেছিল?

—এসেছিল বৈ কি? তোমার ঐ ফ'তো কাপ্তেন মঁসিয়ে ড্যাগ্‌নেট তো সকাল থেকেই এসে হানা দিয়েছিলেন। মঁসিয়ে পল এসে পড়ায় বেচারা কি করবে বুঝতে না পেরে, একেবারে আমার রান্নাঘরে সেঁধিয়ে পড়লো। এই তো কিছুক্ষণ হলো সে গেল।

দুই হাতে চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে নানা বললো—যতসব ট্যাঁকখালির জমিদার! 'পয়সা নেই কড়ি নেই, ফুলমণি দরজা খোলো'! ঝেঁটিয়ে বিদেয় কর! ঝেঁটিয়ে বিদেয় কর!

জো বললো—তা না হয় করলাম, কিন্তু তোমার ঐ ছিনে জোঁকটিকে কি বলবো বলো দিকিনি? ওর তো দেখছি সময়-অসময় নেই।

—তা যা বলেছিস জো! পয়সার নামে অষ্টরম্ভা, ওদিকে রাতদিনের বাবু হ'তে চায়। এবারে লাথ্‌ মেরে বিদেয় করবো ওটাকে, তা তুই দেখে নিস্‌।

জো দুচোখে দেখতে পারতো না লোকটাকে। ওর লম্বাই-চওড়াই বচন আর কথায় কথায় হুকুম শুনে জো ওর উপরে হাড়ে হাড়ে চটে ছিল, কিন্তু দিদিমণির বিপদে আপদে কিছু কিছু সাহায্য করে বলে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারতো না।

নানার বাড়ীতে যে সব লোকের যাতায়াত ছিল, অসাক্ষাতে তাদের কিরকম বিশেষণে ভূষিত করা হতো, নানা আর তার ঝিয়ের কথাবার্তা থেকেই সে সম্বন্ধে কিছুটা আঁচ করতে পারছেন আপনারা। ছিনে জোঁক বলে যাকে বলছিল জো, আসলে সে লোকটা কিন্তু একটা বড় কারবারের মালিক। ড্যাগনেট—যে কিছুক্ষণ আগে জো'র রান্নাঘরে লুকিয়ে পড়েছিল, সেও নাকি খুব বড় ঘরের ছেলে।

ছিনে জোঁক মশাই প্রায়ই রাত কাটাতে সুরু করেছিল নানার ঘরে। ঐ লোকটার জন্য অন্য লোক ঘরে আনতে অসুবিধে হচ্ছিল নানার, কিন্তু তবুও মুখ ফুটে ওকে 'চলে যাও' বলতে পারছিল না সে, কারণ বিপদে আপদে সে-ই ছিল তখন নানার একমাত্র ভরসা।

বালিশটাকে টেনে বুকের নীচে নিয়ে নানা বললো—সে তো হলো! কিন্তু আজকের বাজার-খরচের কি করা যায় বল তো? রুটিওলা, দরজী, গাড়ীওলা, খাবারওলা সবাই তো এলো বলে!

জো বললো—আর যাই করো দিদিমণি, কয়লাওলা ব্যাটাকে আজ দিতেই হবে টাকা। সেদিন যাচ্ছে-তাই করে গেছে সে।

বাড়ী ভাড়া তিনমাস বাকি পড়েছে। বাড়ীওলার সরকার এসে সেদিন শাসিয়ে গেছে যে, এই মাসের মধ্যে সব টাকা শোধ না করলে নালিশ করবে সে। দেনার কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল নানার।

ঘুম থেকে উঠে কিছু খাওয়ার ইচ্ছেও হলো না তার। শুয়ে শুয়েই আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো সে।

হাজারো রকমের দেনা ছাড়াও আর এক বিষম চিন্তা হয়েছে তার ছেলে লুইকে নিয়ে। নানার সতের বৎসর বয়সে এই ছেলের জন্ম হয়। গণিকাবৃত্তি

করে তো আর ছেলেকে কাছে রাখা চলে না, তাই সে লুইকে এক ধাত্রীর হেফাজতে রেখেছিল শহর থেকে দূরে কোন এক পাড়াগাঁয়ে। লুইর বয়স এখন পাঁচ বৎসর।

ধাত্রীকে অনেক দিন যাবৎ কোন টাকাকড়ি দিতে পারেনি নানা। তাই সে বিরক্ত হয়ে বলে পাঠিয়েছে যে, তার প্রাপ্য তিনশ' ফ্রাঙ্ক মিটিয়ে দিয়ে নানা যেন তার ছেলেকে নিয়ে যায়।

উপায়ান্তর না দেখে লুইকে সে তার মাসির বাড়ীতে রাখবে ঠিক করে তাকে খবর পাঠিয়েছিল। তারও আসবার দিন আজই।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে বিছানা থেকে উঠে নানা তার অসংবৃত জামা-কাপড় ঠিক করে নিয়ে একখানা টেবিলের সামনে বসে জমাখরচ লিখতে আরম্ভ করলো। অনেক কাটাকুটি করেও সে দেখলো যে, কমপক্ষে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক তার চাই। অথচ হাতে তার তখন দশ ফ্রাঙ্কও নেই।

জো বললো—কি অতো লিখছো দিদিমণি?

নানা সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললো—অন্ততঃ চারশ' ফ্রাঙ্ক আমার আজই চাই। কোথায় পাই টাকাটা বলতে পারিস?

—ছিনে জোঁকের কাছে যাওনা!

—ওর কাছে একশ' বার চেয়ে দেখেছি, কিন্তু ঐ হাড়-কঞ্জুসের কাছে মাসের বরাদ্দ এক হাজার ফ্রাঙ্কের বেশি একটি পয়সাও আদায় করা যাবে না।

ঠিক এই সময় কলিং বেলের আওয়াজ শুনে নানা চমকে উঠে বললো—গ্যাখ্‌তো জো, কে আবার এলো এই সময়? পাওনাদার-টাওনাদার হলে বলবি যে, দিদিমণি বাড়ীতে নেই, বুঝলি?

জো ঘরের বাইরে গিয়ে সদর দরজা খুলে দিতেই দেখলো যে, মাদাম ট্রিকন এসেছে।

মাদাম ট্রিকনকে দেখেই সাদরে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে এলো সে। তাকে এইভাবে অভ্যর্থনা করবার কারণও ছিল।

মাদাম যখনই আসতো, তখনই কোন না কোন কাপ্তেন বাবুর খোঁজ নিয়ে আসতো। প্রতি বারেই মোটা টাকা পাইয়ে দিতো সে নানাকে। অবশ্য এর জন্য কিছু কমিশনও সে নিতো। তা নিক, যে গরু দুধ দেয়, তার লাথ্‌টাও সহ্য করতে হয় বই কি!

নানার ঘরে ঢুকেই মাদাম বললো—একটা কাপ্তেন বধ করেছি আজ, রাজী তো?

নানা বললো—নিশ্চয়। কত দেবে?

—চারশ' ফ্রাঙ্ক।

—কটায়?

—বিকেল তিনটেয়। কথা পাকা তা হলে?

—নিশ্চয়।

—আমার কিন্তু পঁচিশ ফ্রাঙ্ক, মনে থাকবে তো?

—খুব থাকবে।

বন্দোবস্ত পাকা করে মাদাম ট্রিকন চলে যেতেই নানাও যেন হাঁফ্‌ ছেড়ে বাঁচলো। নতুন কাপ্তেনের কাছে চারশ' ফ্রাঙ্ক পেলে ও থেকেই তিনশ' ফ্রাঙ্ক দিয়ে মাসিকে পাঠাতে পারবে লুইকে নিয়ে আসতে।

জো'কে কিছু খাবার আর চা দিতে বলে আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিল নানা।

বেলা প্রায় এগারটার সময় নানার সেই মাসি এসে হাজির হলো। নানার মাসির নাম মাদাম লিরাত্‌। জো তাকে সঙ্গে করে নানার ঘরে নিয়ে গেল।

নানা তখনও ঘুমুচ্ছিলো দেখে দরজাটা খুলে দিয়েই জো চলে গেল। দরজা খোলবার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল তার। চোখ মেলে মাদাম লিরাত্‌কে দেখে নানা বললো—এই যে মাসি! এসে পড়েছো তাহলে? লুইকে আনতে আজই যাবে তো?

—না যাবো তো এলুম কিসের জন্যে ? বারোটা কুড়ির ট্রেনেই যাবো মনে করেছি। কি বলিস ?

—বারোটা কুড়ির ট্রেনে ? না মাসি, ও গাড়ীতে যাওয়া হবে না তোমার। চারটের আগে টাকার জোগাড় হয়ে উঠবে না।

এই সময় জো এসে খবর দিল—'হেয়ার-ড্রেসার' এসেছে দিদিমণি।

—কে, ফ্রান্সিস ? ডেকে নিয়ে আয়।

ফ্রান্সিস যখন সেই ঘরে এলো, নানা তখনও বিছানায় শুয়ে। তার দেহ প্রায় অনাবৃত বললেই হয়। তার মসৃণ বক্ষের সুপুষ্ট স্তন দুটি সম্পূর্ণভাবে খোলা।

অলসভাবে হাত দিয়ে জামাটাকে একটু টেনে নিয়ে নানা বললো—এখন আর ও ঘরে যেতে ভাল লাগছে না। আমি বরং ঐ দেয়াল-আয়নাটার সামনে বসছি, তুমি এখানেই ড্রেস করে দাও আজ, কেমন ?

এই বলে নানা উঠে দেয়াল-আয়নার সামনে গিয়ে বসতেই ফ্রান্সিস তার চুলটা ঠিক করে দিতে আরম্ভ করলো।

ড্রেস করতে করতে সে বললো—আজকের 'ফিগারো'তে আপনার একটা সমালোচনা বেরিয়েছে, দেখেছেন ?

—কৈ, না তো !

—দেখবেন ? পত্রিকাখানা নিয়েই এসেছি আমি।

—পড়ো তো মাসি, কি লিখেছে ?

মাদাম লিরাত তখন তাড়াতাড়ি উঠে এসে ফ্রান্সিসের হাত থেকে পত্রিকাখানা নিয়ে পাতা উল্টে নানার সম্বন্ধে সমালোচনার পৃষ্ঠাখানা বের করে জোরে জোরে পড়তে আরম্ভ করলো।

সমালোচনা তো নয়, যেন প্রশস্তি। আগাগোড়াই কেবল স্তুতিবাদ। খুশী হয়ে উঠলো নানা এই স্তুতিবাদপূর্ণ সমালোচনা শুনে।

ফ্রান্সিস বললো—আমি তা হলে এখন যাচ্ছি, কেমন ? পত্রিকাখানা কি রাখবেন ?

নানা বললো—হ্যাঁ, পত্রিকাখানা রেখেই যাও।

ফ্রান্সিস বললো—আরও কোন কাগজে যদি কিছু লেখা বের হয়, সেগুলোও জোগাড় করে আনবো কি ?

নানা হেসে বললো—এনো।

ফ্রান্সিস চলে যাবার পর সংসারের সুখদুঃখের কথা আরম্ভ হ'লো মাসি-বোনঝির মধ্যে।

কথায় কথায় মাদাম লিরাত্ জিজ্ঞাসা করলো—হ্যালা নানা! তোর ছেলের বাপ লোকটা কে বলতো?

—সে আছেন এক ভদ্দর লোক।

—ভদ্দর লোক না ছাই! আমি তো শুনেছি, সে সেই রাজমিস্ত্রী ছোঁড়াটা, যে তোকে দিনরাত ঠ্যাঙাতো।

মাদাম লিরাতের কথায় লজ্জা পেয়ে নানা বললো—কি যে বলো মাসি! ঠ্যাঙাতে যাবে কেন সে ?

ওদের যখন এইসব কথা হচ্ছে, সেই সময় মাদাম মালদার এসে ঢুকলো সেই ঘরে।

মাদাম মালদার কিন্তু নামেই শুধু 'মালদার', আসলে সে খুবই গরীব। নানার কাছে প্রায়ই আসতো সে টাকাটা-সিকিটা নিতে বা একটু ভালমন্দ খেতে। মাদাম মালদারের বয়স হয়েছে। বুড়ী না হলেও প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় এসেছে সে।

মাদামের দিকে তাকিয়ে নানা বললো—ওকি! আপনার টুপিটার ও দশা করলো কে ?

নানার প্রশ্নে মাদাম হাসতে হাসতে বললো—আমাদের কি আর ছুঁড়ীদের মত বাহারে টুপি পরবার বয়েস আছে ?

নানা বললো—কিন্তু তাই বলে অমন চমৎকার টুপিটাকে সেলাই করে ঐ রকম ধুচনী বানাতে হয় নাকি ?

ভাল টুপিকে নিজহাতে সেলাই করে বেমক্কা বানানো মাদাম মালদারের একটা বদ্ অভ্যাস।

জো এসে এইসময় খবর দিল যে, টেবিলে খানা দেওয়া হয়ে গেছে।

নানা বললো—মাদাম মালদারও খাবেন আজ আমাদের সঙ্গে, ওঁর জন্যও খাবার দাও।

জো বললো—আচ্ছা দিচ্ছি। আসুন আপনারা।

খাবার টেবিলে বসে নানা একটা কাঁচা মূলো তুলে নিয়ে কচর কচর করে চিবোতে সুরু করে দিল।

মাদাম লিরাত্ হাঁ হাঁ করে উঠলো নানার মূলো-খাওয়া দেখে।

সে বললো—কচ্ছিস্ কি নানা! কাঁচা মূলো খেলে পেট ফাঁপবে যে?

—পেট ফাঁপবে না ছাই! মূলো আমার খুব ভাল লাগে।

এই সময় জো একখানা প্লেটে করে কতকগুলো গরম কাট্‌লেট্ এনে প্রত্যেকের পাতে তিনখানা করে দিয়ে গেল।

কাট্‌লেট্ কিন্তু নানা ছুঁলোও না।

একখানা ব্রেস্ট কাট্‌লেট্ থেকে হাড়টা বের করে নিয়ে চিবোতে চিবোতে নানা বললো—আর কিছু নেই?

জো তখন একটা রোস্ট-করা মুরগী এনে তিন খণ্ডে কেটে তিনজনের পাতে পরিবেশন করে গেল।

মাদাম মালদার আর মাদাম লিরাত্ দুজনেই মহা আনন্দে কাটলেট্ আর রোস্ট খেতে সুরু করলেও নানা কিন্তু ওগুলো মুখেও তুললো না।

কয়েকটা মিষ্টি তুলে নিয়ে খেয়েই আহার শেষ করলো নানা।

খাওয়া শেষ হবার আগেই বাইরের ঘরে কলিং বেলের আওয়াজ শুনতে পেয়ে নানা বললো—দ্যাখ্ তো জো, আবার কোন মুখপোড়া এলো?

জো তাড়াতাড়ি বাইরে যেয়ে দরজা খুলতেই একেবারে অবাক হয়ে গেল।

"ওমা! এ যে একদল অচেনা লোক!"

সবারই হাতে একটা করে ফুলের তোড়া। নানাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছে ওরা।

এর পর মিনিটে মিনিটে আসতে লাগলো স্তাবকের দল। কারো হাতে ফুলের তোড়া, কেউ এনে'ছ অভিনন্দন-পত্র, আবার কেউ বা এনেছে প্রেমপত্র।

প্রেমিক আর স্তাবকের দলে ভরতি হয়ে গেল নানার বাড়ী। দু'চারজন পাওনাদারও এসে টাকার তাগাদার বদলে অভিনন্দন জানিয়ে গেল নানাকে।

এদিকে বেলা প্রায় তিনটে বাজলেও অভিনন্দন-জানানেওয়ালারা ওঠবার নামও করছে না দেখে নানা উসখুস করতে লাগলো। সে তখন কাউকে কিছু না বলে শোবার ঘরে এসে জামা-কাপড় পরে তাড়াতাড়ি পেছন দরজা দিয়ে বাড়ী থেকে বের হয়ে গেল।

এদিকে বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে, তবু নানা ফিরছে না দেখে, মাদাম লিরাত্ ঘন ঘন উঠে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকাতে স্বরু করলো। প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় নানা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত হতেই মাদাম বললো—টাকা পেয়েছিস?

নানা কোন কথা না বলে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চারখানা একশ' ফ্রাঙ্কের নোট বের করলো।

মাদাম বললো—দে, আর দেরি করিস নি। এখনও গেলে হয়তো ছ'টার গাড়ী পাওয়া যাবে।

নানা বললো—একটু সবুর করো। একখানা নোট ভাঙাতে হবে। তোমার যাতায়াতের জন্য গাড়ীভাড়া ছাড়াও মাদাম ট্রিকনকে কমিশন দিতে হবে, তাছাড়া আমারও তো কিছু চাই।

কিন্তু বিপদ বাধলো নোট ভাঙানো নিয়ে।

তখনই কোথায় পাওয়া যায় ভাঙানি!

বিপদ উদ্ধার করলো জো।

—তাই নাকি! তা হলে তো নিশ্চয়ই কিছু দেওয়া দরকার। তবে কি জানেন, উপস্থিত আমার হাতে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্কের বেশি নেই। আজ এই নিয়ে যান, পরে সুবিধে হলে আরও কিছু দেবো।

"পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক চাঁদা দিচ্ছে এ!" কাউণ্ট আর মার্ক্ইস্ দুজনেই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন নানার বদান্যতায়।

নানা তখন তার সেই দিনের রোজগার থেকে যা কিছু নিজের জন্যে রেখেছিল, সবই এনে কাউণ্টের হাতে দিয়ে বললো—এই নিন!

শত ধন্যবাদ দিয়ে মার্ক্ইস্ আর কাউণ্ট চাঁদা নিয়ে চলে গেলেন।

নানা মনে মনে হেসে বললো—হঠাৎ আমার বাড়ীতে চাঁদা চাইতে কেন এসেছো যাদুরা, সেকি আর আমি জানিনা?

ওঁরা চলে যেতেই জো বলে উঠলো—করলে কি দিদিমণি! সব টাকাই দিয়ে দিলে ওঁদের?

নানা বললো—তুই কি বুঝবি? এ টাকা আমি ভবিষ্যতের জন্য দাদন দিলাম।

নানার কথা শেষ না হতেই আবারও কলিং বেল বেজে উঠলো। এবারে কিন্তু সত্যিই ধৈর্য হারিয়ে ফেললো নানা।

সে বললো—বলে আয় যে, আজ আর দেখা হবে না।

জো চলে গেল, কিন্তু একটু পরেই আবার ফিরে এসে বললো—মঁসিয়ে ষ্টিনার এসেছে যে?

—কে? সেই ভুঁড়িওয়ালা সুদখোরটা? তুই তাহলে দাঁড়া, ব্যাটা ভুঁড়িদাসকে আমিই বিদেয় করে আসছি।

জো বললো—লোকটাকে অপমান না করলেই ভাল হয় দিদিমণি। শুনেছি, ওর নাকি অনেক পয়সা।

যেতে যেতেই নানা বললো—যে মানুষকে বশ করতে হয়, তাকে প্রথমে একটু অপমানই করতে হয়, তা জানিস্? এই বলে একটু মুচাক হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

ষ্টিনারকে বিদায় করে নানা ঘরে ফিরে এসেই অবাক হয়ে গেল।

সে দেখলো, ঘরের কোণে একটা ছোকরা ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে জড়ো-সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নানা বললো—তুমি আবার কে হে ছোক্‌রা?

—আমার নাম জর্জ। জর্জ হিউজেন।

—তা এখানে কি মনে করে? আর এলেই বা কোন্ পথে?

—আমি পেছনের জানালা টপকে এসেছি। সামনের দিকে অনেক লোকজন কিনা? একটু থেমে ছোকরাটি আবার বললো—আপনার জন্য এই ফুলের তোড়াটা এনেছিলাম!

—এনেছিলে যখন, তখন আর ওটাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছো কেন? দিয়ে ফ্যালো!

এই বলে ফুলের তোড়াটি ওর হাত থেকে নেবার জন্য হাত বাড়াতেই ছেলেটি এক কাণ্ড করে বসলো। সে তোড়াটি নানার হাতে দিয়েই তাকে সবলে জড়িয়ে ধরে তার মুখে, চোখে, কপালে অজস্র চুমু দিতে স্থরু করলো।

স্কুলের একজন ছোক্‌রার এই প্রেমের অভিব্যক্তি দেখে, নানা হাসবে কি রাগ করবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না। সে লক্ষ্য করলো যে, ছেলেটিকে দেখতে বেশ। একটু প্রীতির সঞ্চারও বোধ হয় হলো তার ছেলেটির উপরে। সে বললো—খুব হয়েছে, এখন বাড়ী যাও দেখি! আর একদিন বরং এসো, বুঝলে? জর্জ তখন নানাকে ছেড়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। যাবার সময় সে বারবার নানার দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে তাকাতে গেল।

জর্জ চলে যেতেই নানা একখানা ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো।

"ভিতরে আসতে পারি কি?" দরজার বাইরে থেকে কে যেন বলে উঠলো।

নানা বললো—কে ? লা বোর্দেত্ নাকি ?

—হ্যাঁ।

—আরে এসো এসো !

নানার অনুরোধে ভিতরে এলো লা বোর্দেত্।

নানা অনুযোগের স্বরে বললো—এত লোক এসেছে আজ সকাল থেকে, কিন্তু তুমি এলে এত দেরি করে ?

—কি করবো বলো ? তুমি যে কাজের বোঝা চাপিয়েছিলে আমার কাঁধে, সেটাকে নাবাতে হবে তো ?

লা বোর্দেত্কে নানা খুবই শ্রদ্ধা করতো, কারণ সে-ই ছিল একমাত্র পুরুষ, যে কোনরকম উদ্দেশ্য না নিয়েই তাকে সাহায্য করতো।

নানা বললো—আজ রাত্রে তুমি এখানেই খাবে ! খেয়ে দেয়ে তোমার সঙ্গেই থিয়েটারে যাবো আজ, কেমন ?

তিন

কাউণ্টেস স্যাবাইনের উদ্যোগে আজ এক ভোজের আয়োজন হয়েছে মাফাত প্রাসাদে।

রাত দশটা।

ড্রইংরুমের চিমনিতে আগুন জ্বেলে দেওয়া হয়েছে কিছুক্ষণ আগে, কিন্তু ঘরখানা তখনও গরম হয়ে ওঠেনি।

কাউণ্টেস একখানা চেয়ারে বসে তাঁর বাল্যসঙ্গিনী মাদাম-দ্য-সেজেল-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। কাউণ্টেসের পাশের চেয়ারে বসে ছিল তাঁর মেয়ে—এস্টেল।

এস্টেল ষোড়শী। বয়সের অনুপাতে ছোট দেখালেও সুন্দরীই বলা চলে তাকে!

কাউণ্টেসের বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। কিন্তু এত বয়স হলেও কাউণ্টসের দেহ থেকে রূপ আর সৌন্দর্য তখনও বিদায় নেয় নি। তাঁর পরিপুষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সবই যেন যৌবন-লাবণ্যে ভরপুর।

কাউণ্টেস বলছিলেন—শুনলাম, এবারকার একজিবিশনে নাকি প্রুশিয়ার রাজা আর রাশিয়ার জার আসছেন?

কথার জের টেনে মাদাম-দ্য-জনকুয়ে বললেন—পারশিয়ার শাহ নজরুদ্দিনও আসবেন শুনেছি।

ওঁরা যখন রাজা-রাজড়ার কথা বলছিলেন, সেই সময় ব্যাঙ্কার ষ্টিনারকে দেখা গেল একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে একটা অর্থ নৈতিক সমস্যা নিয়ে তর্কাতর্কি করতে।

কাউণ্ট মাফাত্ ওদের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। হয়তো ওদের কথাই শুনছিলেন তিনি। অন্যত্র কাউণ্ট জেভিয়ার-দ্য-ভাঁদেভোকে ঘিরে তার কয়েকজন বন্ধু বান্ধব তরল হাস্যপরিহাসের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিয়েছিল।

মোট কথা, আসরটা বেশ ভালভাবেই জমে উঠেছিল তখন। এই সময় হেক্তর-দ্য-লা ফ্যালিজ-এর সঙ্গে 'ফিগারো'-পত্রিকার সম্পাদককে আসতে দেখা গেল।

কাউণ্ট মাফাত্-এর বাড়ীতে ফুচেরির এই প্রথম পদার্পণ।

সম্পাদককে দেখতে পেয়েই কাউণ্টেস উঠে গিয়ে অভ্যর্থনা করলেন তাকে।

ফুচেরি বললো—আপনার নিমন্ত্রণরক্ষা করতে পেরেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করছি কাউণ্টেস।

কাউণ্টেস মৃদু হেসে বললেন—আপনার কাজের ক্ষতি হলো তো?

—তা হোক! কাজ তো রোজই আছে।

কাউণ্টেস তখন হেক্তর আর ফুচেরিকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করে অন্যান্য অতিথির আদর-আপ্যায়ন ঠিকমত হচ্ছে কিনা, তার তদারক করতে চলে গেলেন।

ফুচেরি তখন এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলো যে, তার চেনাশুনা কেউ এসেছে কিনা?

হঠাৎ কাউণ্ট-দ্য-ভাঁদেভো'র দিকে নজর পড়ায় সে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো—এই যে! আপনিও এসেছেন দেখছি?

ভাঁদেভোও খুশী হয়েছিল ফুচেরিকে দেখে।

সে দাঁড়িয়ে উঠে ফুচেরির সঙ্গে করমর্দন করে জনান্তিকে বললো—ওদিকের ব্যবস্থা সব ঠিক আছে তো?

ফুচেরি বললো—তা আছে। কাল রাত বারোটায়, তার ওখানেই।

—ব্লান্সিকেও নিয়ে যাবো তো?

—নিশ্চয়।

এই কথা বলে ভাঁদেভোকে ইশারা করে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে সে আবার বললো—কিন্তু ভাই, আমার উপরে এক সাংঘাতিক কাজের ভার দিয়েছে ও।

—কী এমন সাংঘাতিক কাজ বলো তো?

—তা সাংঘাতিক বৈ কি! ও জেদ ধরেছে যে, কাউণ্ট মাফাত্‌কে নিয়ে যেতে হবে ওর বাড়ীতে।

—তাই নাকি! কিন্তু কাউণ্ট কি যাবেন ওখানে? তা ছাড়া, ওঁকে বলবেই বা কে?

—বলতে শেষ পর্য্যন্ত আমাকেই হবে, কিন্তু আমি ভাবছি যে, এই কথা শুনে কাউণ্ট ক্ষেপে না যান! আমি জাঁক দেখিয়ে বলে এসেছি যে, কাউণ্টকে নিশ্চয়ই নিতে যেতে পারবো। যদি না পারি, তা হলে খুবই খেলো হতে হবে আমাকে।

এই সময় একজন খানসামা এসে কাউণ্ট ভাঁদোভোকে অভিবাদন করে জানালো যে, মহিলা-মহলে ডাক পড়ছে তাঁর।

ভাঁদেভো এই লোভনীয় ডাক শুনেই কেটে পড়লো ওখান থেকে।

লা ফ্যালিজ এতক্ষণ অদূরে দাঁড়িয়ে ওদের দুজনের কথাগুলো যেন গিলছিলো। ভাঁদেভো চলে যেতেই সে এগিয়ে এসে ফুচেরির কানে কানে বললো—কাল রাত্রে কার বাড়ীতে বলছিলে?

ফুচেরি ব্যস্তভাবে চারদিকে তাকিয়ে বললে—চুপ! কেউ শুনে ফেলতে পারে। পরে বলবো'খন তোমাকে।

ফুচেরি তখন ঘুরে ঘুরে এর ওর তার সঙ্গে আলাপ করে বেড়াতে আরম্ভ করলো।

হঠাৎ কাউণ্টেসের দিকে দৃষ্টি পড়ায় তার মন যেন হু হু করে উঠলো।

সে ভাবলো—"কাউণ্টসকে দেখতে কিন্তু সত্যিই চমৎকার। কিন্তু কাউণ্টেস কি সুখী? ঐ রকম গোমড়ামুখো স্বামীর সঙ্গে এই রাজকীয়

বন্দিশালায় আটক থাকলে কোনো নারীই সুখী হতে পারে না। কিন্তু সুখী না হলেও স্বামী ছাড়া অন্য কোন লোকের উপরে ভালবাসাও আসতে পারে না এই রকম নারীদের। এসব যায়গায় নিজেকে খারাপ পথে নেবার সুযোগ বেশি নেই।"

এই সব ভাবতে ভাবতে কাউণ্টেসের মুখের দিকে চোরা চাউনিতে চাইলো ফুচেরি।—"কী সুন্দর ঠোঁট দুখানি! যেন রসে ভরা পাকা আঙুর দুটি!"

হঠাৎ ফুচেরি লক্ষ্য করলো যে, কাউণ্টেসের বাঁ দিকের গালের উপর একটা কাল তিল।

"কি আশ্চর্য! ঠিক ঐ রকম তিল যে নানার গালেও আছে!" সে তখন আরও ভালভাবে লক্ষ্য করতে লাগলো কাউণ্টেসের মুখের দিকে। সে দেখলো যে, নানার মুখের সঙ্গে কাউণ্টেসের মুখের আশ্চর্যরকম মিল। চেহারার সাদৃশ্য যে মনোবৃত্তিরও সাদৃশ্য ঘটায়, এ তথ্য ভাল করেই জানা ছিল ফুচেরির। তাই তার আশা হলো যে, এখানে টোপ ফেললে হয়তো কাজ হ'তেও পারে।

খানাপিনা আরম্ভ হয়ে গেল।

খানাপিনার ফাঁকে ফাঁকে সম্পাদক মশাই প্রায়ই কাউণ্টেসের দিকে বাঁকা চোখের দৃষ্টিক্ষেপ করতে সুরু করলো। তার ধারণা যে, ডুবে ডুবে জল খেলে একাদশীর বাবাও টের পাবে না। কিন্তু 'একাদশী' মশাইও যে তার দিকে দৃষ্টি রেখেছে, এ খবর সে জানতেই পারলো না।

এই একাদশী মশাই হচ্ছেন কাউণ্ট মাফাত্-এর এটর্নি এবং মাফাত্-পরিবারের বহুদিনের বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী মঁসিয়ে ভেঁনো।

এই চতুর এবং কুটবুদ্ধি এটর্নিকে সবাই সমীহ করে চলতো।

খানাপিনা শেষ হলে ফুচেরি আর ভাঁদেভো দুজনেই ফাঁক খুঁজতে লাগলো, কখন কাউণ্টকে আগামী কালের নিমন্ত্রণের কথাটা বলা যায়।

সুযোগও জুটে গেল।

কাউণ্ট কি একটা কাজে ফুচেরির কাছাকাছি আসতেই সে দাঁড়িয়ে উঠে বললো—আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল কাউণ্ট!

—আমার সঙ্গে! কি কথা বলুন?

—একটু ওদিকে চলুন বলছি। কথাটা গোপনীয়।

ফুচেরি আর ভাঁদেভো দুজনে কাউণ্টকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললো—এক ভদ্রমহিলা কাল আপনাকে নৈশ ভোজে নিমন্ত্রণ করেছেন?

—মহিলা! কে বলুন তো?

ফুচেরি আস্তে করে উচ্চারণ করলো—"নানা"।

—নানা! থিয়েটারের সেই লাস্যময়ী অভিনেত্রী? তার সাহসটা তো বড় কম নয়?

—তা হলে কি আমরা ধরে নেবো যে, আপনি যাবেন না?

—নিশ্চয়ই। তা ছাড়া এইরকম প্রস্তাব আপনারা করলেন কি করে, সেই কথা ভেবেই আমি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি। আমি—আমি যাবো একজন অভিনেত্রীর বাড়ীতে?

ফুচেরিও দমে যাবার পাত্র নয়। কাউণ্ট মশাই যে ইতিমধ্যেই নানার বাড়ীতে পদার্পণ করে এসেছেন, সে খবর তার জানা ছিল, তাই সে বললো—কথাটা তা হলে না বলে পারছি না কাউণ্ট! নানার বাড়ীতে আপনার যাতায়াত যে নেই, তা তো নয়?

ফুচেরির এই কথায় কাউণ্ট মাফাত্-এর মুখখানা একেবারে এতটুকু হয়ে গেল। হঠাৎ কোন কথাই যোগালো না তাঁর মুখে। পরে ভেবেচিন্তে বললেন—না—তা—হ্যাঁ—মানে একদিন গিয়েছিলাম ওর ওখানে, মানে সে হচ্ছে গিয়ে, ঐ কি বলে—মানে আর্তত্রাণ সমিতির চাঁদা চাইতে।

সম্পাদক হেসে বললো—আর্তত্রাণ সমিতির চাঁদা চাইতে কি এখন কাউণ্টকেও বের হ'তে হয় নাকি? কিন্তু নানার বাড়ী ছাড়া আর

কোথাও থেকে তো কাউণ্টের চাঁদা-আদায়ের কথা শোনা যায় নি এর আগে ?

কাউণ্টের বিব্রত অবস্থা দেখে ভাঁদেভো বললো—এ তুমি কি বলছো ব্রাদার ? কাউণ্ট পুরুষমানুষ। কোন পুরুষ মানুষ যদি যায়ই কোন অভিনেত্রীর বাড়ীতে, সেটা কি খুব দোষের ?

কাউণ্ট পড়লেন মহা ফাঁপরে।

নটী-বাড়ীর নেমন্তন্ন। যেতে ইচ্ছেও হচ্ছে, আবার লজ্জাও হচ্ছে। তিনি কি বলবেন না বলবেন ভাবছেন, এই সময় হঠাৎ তাঁর নজর পড়লো বুড়ো এটর্নির দিকে। মঁসিয়ে ভেনো তীব্র দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন ওঁদের দিকে।

এটর্নির ঐ রকম জ্বলন্ত দৃষ্টি দেখে কাউণ্ট থতমত খেয়ে বললেন—না, না, আমি যাবো না, আমি যেতে পারবো না !

এই কথা বলেই কাউণ্ট মাফাত্ সরে পড়লেন ওখান থেকে। কাউণ্ট সরে পড়তেই লা ফ্যালিজের উদয় হলো সেখানে।

সে বললো—আমি বুঝতে পেরেছি, কোথায় তোমাদের মাইফেল হবে। আমাকে ফাঁকি দেবে মনে করেছিলে, না ? আমি তোমাদের আগেই যেয়ে হাজির হবো, দেখে নিও !

চার

নানার বাড়ীতে নৈশ ভোজ।

নটী-বাড়ীর ভোজ, বুঝতেই পারছেন সেকি কাণ্ড!

হঠাৎ পয়সা পেয়ে বড়লোক হয়ে নানা এখন জাতে উঠতে চাইছে।

খানাপিনা-সাপ্লাই'র ভার দেওয়া হয়েছে এক আধা-নামকরা ক্যাটারিং কোম্পানিকে। টেবিল, চেয়ার, ফুলদানি প্রভৃতি সাপ্লাই আর ডেকরেশনের ভার নিয়েছে এক ডেকরেটিং কোম্পানি। কাঁটা, চামচে, কাপ, প্লেট—সবই দেবে সেই ক্যাটারিং কোম্পানি এবং পরিবেশনও করবে তারাই।

নানা আর তার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা আজ সকাল থেকেই ব্যস্ত অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থায়।

সারাদিন পরিশ্রম করে ঘর-দোর সাফ করছে ওরা।

সন্ধ্যার একটু আগেই ডেকরেটার এসে গেল গাড়ী-বোঝাই চেয়ার, টেবিল, ফুলদানি ইত্যাদি নিয়ে।

নানার সেদিনও 'প্লে' ছিল, তাই সে তার বন্ধুদের উপরে সব কিছু ব্যবস্থার ভার দিয়ে সন্ধ্যার একটু পরেই বেরিয়ে পড়লো।

অভিনয় শেষ হতেই নানা বাড়ীতে চলে এলো।

এদিকে জর্জ আর ড্যাগনেট—দুজনের ব্যবস্থায় সব কিছু একেবারে ঠিক।

বাড়ীতে এসে নানা খুশী হয়ে উঠলো ব্যবস্থা দেখে।

নিমন্ত্রিতরা জোড়ায় জোড়ায় আসতে আরম্ভ করলো। প্রথমেই এলো ক্লারিসি আর লা ফ্যালিজের জোড়া। ওদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলো রোজি আর তার স্বামী মঁসিয়ে মিগনন্। হুঁদকো মোটা ব্যাঙ্কার ষ্টিনারকেও দেখা গেল রোজির পেছনে পেছনে। ওদের পরেই এলো মাদাম ব্লান্সি আর

কাউণ্ট ভাঁদেভো এবং তার পরে দেখা দিল লুসি আর 'ফিগারো'র সম্পাদক ফ্রুচেরি।

ফ্রুচেরিকে দেখেই নানা তার কাছে এগিয়ে গিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলো—কাউণ্ট আসছেন তো?

ফ্রুচেরি অম্লানবদনে মিথ্যা কথা বললো—না, তিনি আজ আসতে পারলেন না; কারণ, আজ তাঁর 'হিজ ম্যাজেষ্টি দি কিং'-এর সঙ্গে 'অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট' আছে।

নানা বুঝতে পারলো যে, ফ্রুচেরি মিথ্যা কথা বলছে, তাই সে বললো—এটা তোমার বানানো কথা। তুমি নিশ্চয় কাউণ্টকে বলো নি।

ফ্রুচেরি বললো—বলেছি কি না বলেছি, তিনি এলে জিজ্ঞেস করে নিও। তা ছাড়া এরকম কাজের ভার আর কখনও আমার উপর দিও না। এ-সব কাজে হয় মিগনন্, আর না হয় লা বোর্দেত্‌কে পাঠিয়ো, বুঝলে?

নানা রাগতঃ ভাবে উত্তর দিল—বেশ, তাই হবে।

ফ্রুচেরিকে অপমান করবার জন্য নানার মন উসখুস করতে লাগলো। এই সময় ষ্টিনারকে ওখানে আসতে দেখে সে হঠাৎ বলে উঠলো—এই যে মঁসিয়ে ষ্টিনার! খানার টেবিলে আপনি আজ আমার পাশে বসবেন, বুঝলেন?

ষ্টিনার কিছু বলবার আগেই ঘরের বাইরে একপাল মেয়ে-পুরুষের উচ্ছ্বসিত হাসির ধমকে চমকে উঠলো সবাই।

সে কি হাসি! বাপ্‌স্‌!

একটু পরেই লা বোর্দেত্‌কে দেখা গেল একদঙ্গল মেয়েছেলেকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে।

গাগা ওদেরই মধ্যে একজন।

সে এসেছে নীল রঙের মখমলের পোশাক পরে—যেন যাত্রার দলের ছুক্‌রীটি?

কেরোলিনার পোশাক আবার কালো। যেন গীর্জায় এসেছে ধর্মকর্ম করতে! লিয়ে এসেছে আধ-ময়লা পোশাকে। টাটান্, নিনি এবং আরও যারা এসেছে, তাদের পোশাকের বর্ণনা নাই-বা করলাম।

ওদের মধ্যে সবচেয়ে কাঁচা বয়স হচ্ছে মেরিব্লণ্ডের। বোধ হয়, পনের-ষোলর বেশি হবে না ওর বয়স। কিন্তু এই বয়সেই ওর মুখে পড়েছে অত্যাচারের ছাপ।

স্টিনার বললো—সবাইকেই দেখছি, কিন্তু আমাদের ম্যানেজার মশাইকে তো দেখতে পাচ্ছি না?

নানা বললো—তিনি আজ আসতে পারবেন না। পা মচ্‌কে গিয়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে বেচারার।

নানার কথা শেষ না হইতেই ম্যানেজারের বচন শুনতে পাওয়া গেল বাইরে। অভিনেত্রী সাইমনির কাঁধে ভর দিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে আসছিল সে।

ঘরে ঢুকেই ম্যানেজার বললো—তোমরা বুঝি ভেবেছিলে যে, আমাকে বাদ দেবে আজকের এই চাঁদের মেলা থেকে? সেটি হ'তে দিচ্ছি না বাবা!

ম্যানেজারের আগমনে সবাই খুশী হয়ে উঠলো। নানা নিজে তাকে খাতির করে ধরে নিয়ে একখানা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললো—এই পা নিয়ে কষ্ট করে না এলেই পারতেন?

ম্যানেজার বললো—তা কি হয়? আজ যে আমায় আসতেই হবে। নানার বাড়ীতে ভোজ, আমি কি না এসে থাকতে পারি?

নানা খুশী হয়ে উঠলো ম্যানেজারের এই অকৃত্রিম ব্যবহারে। হঠাৎ নানার মনে পড়ে গেল যে, এতক্ষণ খাবার দেওয়া উচিত ছিল; তাই সে বিরক্ত হয়ে বললো—কী ব্যাপার! এখনও খাবার দিচ্ছে না যে? ছাখো তো ড্যাগনেট্, ব্যাপার কি?

ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়! নটী-বাড়ীর নেমন্তন্নে ওরকম হয়েই থাকে। নিয়ম-কানুন বলে তো কিছু থাকে না এসব জায়গায়!

এই সময় আবার একদল লোককে আসতে দেখে নানা একেবারে তেলে-বেগুনে জলে উঠলো। কাউণ্ট ভাঁদেভোকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো সে—এরা আবার কারা?

ভাঁদেভো বললো—এঁরা সবাই গণ্যমান্য লোক। কাল কাউণ্ট মাফাতের বাড়ীতে ভোজের সময় এঁদেরকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম আমি।

কাউণ্টের মুখে এঁদের পরিচয়ে নানা একেবারে জল হয়ে গেল।

সে বললো—তা বেশ বেশ! দেখো, এঁদের যেন কোন রকম অযত্ন না হয়!

এই সময় একজন বুড়ো গোছের ভদ্রলোককে দেখা গেল নানার শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে। লোকটিকে ওখানকার অনেকেই চিনতো না, তাই পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো ওরা। সবারই মুখে চাপা হাসি। সবাই মনে মনে বুঝে নিল যে, এটি নানার নূতন মক্কেল। আজকের ভোজের খরচটা হয়তো এর ঘাড় ভেঙ্গেই চালানো হচ্ছে।

ক্যাটারিং কোম্পানির খানসামা এই সময় এসে বললো—খানা তৈরী, আপনারা আসতে পারেন।

নানা তখন স্টিনারের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে খাবার ঘরের দিকে চলতে লাগলো। সেই বুড়ো ভদ্রলোক নানার ভাবগতিক দেখে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সসম্মানে পশ্চাদপসরণ করাই শ্রেয় মনে করে পিছিয়ে পড়লো।

নানা গিয়ে 'হোস্টেস্'-এর আসনের সামনে দাঁড়িয়ে চাল দেখিয়ে বললো—বন্ধুগণ! আপনারা ইচ্ছামত আসনে উপবেশন করুন। আমার এখানে কোনই বাধানিষেধ নেই। এটা হচ্ছে প্রীতিভোজ। প্রীতিভোজের মজাই হচ্ছে এই যে, সবাই এখানে নিজের খুশিমত আনন্দ উপভোগ করতে পারেন।

হঠাৎ ওদের মনে পড়ে গেল যে, ম্যানেজার মশাইকে আনা হয় নাই। বেচারার পা মচ্‌কে যাওয়ায় নিজে নিজে আসবার ক্ষমতা নেই। নানা ম্যানেজারের কথা বলতেই কয়েকজন অভিনেত্রী ছুটে গিয়ে চ্যাংদোলা করে নিয়ে এলো তাঁকে।

ফুচেরি বলে উঠলো—ম্যানেজার মশাইকে মাঝখানে দাও। আজকের ভোজে উনিই হবেন চীফ্‌গেস্ট, কেমন ?

সবাই সানন্দে সম্মতি জানালো এই প্রস্তাবে।

ম্যানেজারকে ধরে নিয়ে গিয়ে জায়গা-মত বসিয়ে দিতেই সে বললো—সবাই এসেছে, কিন্তু প্রুলিয়ার অর ফণ্টান বেচারা বাদ গেল। ওরা দুজনে এলেই ষোলকলা পূর্ণ হ'তো !

নানা বললো—ওরা না এসে ভালই হয়েছে। এই রকম একটা রেস্‌পেক্‌টেবল্ গ্যাদারিং-এ ওদের মত লোক না আসাই ভাল।

খাদ্যদ্রব্যের কোন নূতনত্ব ছিল। সাধারণতঃ হোটেলে যে সব খাবার পরিবেশিত হয়, সেই সব খাবারই পরিবেশন করা হয়েছিল চটা-ওঠা আধময়লা প্লেটে করে। কাঁটা-চামচের অবস্থাও তথৈবচ। অনেকদিনের ব্যবহারে নিকেল উঠে ভিতর থেকে পিতল বেরিয়ে পড়েছিল সেগুলোর।

অতিথিরা কেউই তৃপ্তির সঙ্গে খেতে পারছিল না। ওরা তখন খাদ্য ফেলে রেখে পানীয়ের দিকেই জোর দিল। গ্লাসের পর গ্লাস চলতে লাগলো রকমারি মদ।

মদের নেশা মেয়েদেরই লাগলো আগে। ওদের 'দিল্'গুলো সব 'দরিয়া' হয়ে গেল দেখতে দেখতে। কারো কারো আবার বাৎসল্যও উথলে উঠলো ছেলেমেয়েদের জন্য।

ব্লান্সি লুসিকে বললো—কাল তোমার ছেলেটাকে দেখলাম রাস্তায়। দিব্বি ডাগরটি হয়েছে।

লুসি বললো—তা হবে না? এই তো সতের গিয়ে আঠারোয় পা দিয়েছে অলিভার।

রোজ মিগনন বললো—আমিও কাল গিয়েছিলাম হেনরি আর চার্লসকে দেখতে। বোর্ডিং-এ পড়ে থাকে বাছারা। আমাকে দেখে কত আনন্দ করতে লাগলো!

ভাঁদেভো জিজ্ঞাসা করলো—তোমার বড় ছেলের বয়স কত?

রোজি বললো—এই তো সবে ন' বছর। লেখাপড়ায় ভাল, তা ছাড়া চালাক-চতুরও মন্দ নয়, তবে বড় দুষ্টু।

কিছুক্ষণ পরেই হাওয়া বদলে গেল ঘরের। মদ আর মেয়েমানুষ যেখানে অপর্য্যাপ্ত, সেখানকার হাওয়া কি ঠাণ্ডা থাকতে পারে?

এর পরেই সুরু হয়ে গেল পাল্লা দিয়ে প্রেম-নিবেদনের পালা।

ফুচেরিকে দেখা গেল রোজ মিগননকে নিয়ে দুটো রসের কথা বলতে।

লা ফ্যালিজ তো তার দিদিমার বয়সী গাগাকেই প্রেম নিবেদন সুরু করে দিল।

জর্জ ছোকরা ছিল নেহাতই ছেলেমানুষ। ব্যাপার-স্যাপার দেখে বেচারা ঘাবড়ে গিয়ে ড্যাগনেটকে জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা এই মেয়েছেলেরা কি সবাই ছেলের মা?

ড্যাগনেট বললো—তা নয় তো কি? ঐ যে দেখছো লুসি! ওর বাবা ছিল রেলের শ্রমিক। ইংরেজের মেয়ে ও। লুসির বয়স এখন প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু তা হলে কি হয়। এখানে যত মেয়েছেলে জুটেছে, তাদের মধ্যে ও-ই হচ্ছে সবচেয়ে বড় খলিফা। তিন-তিনটে প্রিন্স আর একজন ডিউককে ঘায়েল করেছে ও।

আর ঐ যে দেখছো কেরোলিনাকে! উনিও মক্কেল কম নন। ওর মায়ের স্বভাব-চরিত্র নিয়ে কথা উঠলে লজ্জায় ওর বাপ বেচারা আত্মহত্যা করে।

তার পরে ওরা মা-মেয়েতে একটা পোশাকের দোকান খুলে বসেছে। রোজগার চলে দিনরাত।

তাছাড়া ব্লান্সিকে তো চেনোই! ও বলে যে, ওর বাবার বাবা নাকি নেপোলিয়নের সময় সেনাপতি ছিলেন। বয়স নাকি এখনও ত্রিশ পেরোয় নি ওর। কিন্তু আমি জানি যে, ওর ঠাকুর্দা নয়, ও নিজেই নেপলিয়নের আমলের লোক। বেজায় মিথ্যেবাদী।

ক্লারিসিও কম যায় না। এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঝি হয়ে ঢুকে একেবারে কর্তাটিকেই ঘায়েল করে বসলো! গুণী মেয়েমানুষ! সাইমনির বাবার নাম কেউ জানেনা, বোধ হয় ও নিজেও জানে না। মারিয়া, লুইসি আর লিয়েন্ত-হর্ণ—এদের তিনজনেরই কোন অতীত নেই। এরা 'অলওয়েজ প্রেজেণ্ট টেন্স'। এখন বাকী রইলো টাটান। ইনি হচ্ছেন এক চাষার মেয়ে। এতকাল মাঠে গরু-ভেড়া চরিয়েছেন, এখন শহরে এসে পুরুষ-মানুষ চরাচ্ছেন।

এতগুলো সতীকুলশিরোমণির একত্র সমাবেশ দেখে জর্জ বেচারার অবস্থা যা হলো, সে আর কহতব্য নয়।

নানার বেশ নেশা ধরেছিল। মাঝে মাঝে সে চীৎকার করে উঠছিল। একবার সে বলে উঠলো—জানো তোমরা! আমার অভিনয় দেখবার জন্য প্রিন্স আকোসি আসছেন সামনের রোববারে!

নানার কথায় ম্যানেজার একগাল হেসে বললো—শুধু প্রিন্স আকোসি কেন? প্যারীতে এবার যত রাজা-মহারাজা আসছেন, সবাইকেই একবার আমার ওখানে পায়ের ধূলো দিতে হবে এবার। যে চুম্বক রয়েছে, তাতে সবাইকেই টানবে। এই বলেই নানার দিকে তাকিয়ে হেঁ হেঁ করে হেসে উঠলো সে।

নানা বললো—পারশিয়ার শাহ-ও নাকি থিয়েটারে আসবেন?

পারশ্যের শাহ-প্রসঙ্গ উঠতেই লুসি বললো—পারশিয়ার শা'! বলছো কি? তিনি তো মস্ত বড়ো রাজা! একবার তাঁকে দেখবার—মানে খুব

কাছে থেকে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। কী দামী দামী হীরে! মাথার পাগড়ী থেকে পায়ের জুতো পর্যন্ত কেবলই হীরে, মুক্তা আর সোনা।

আর একজন বলে উঠলো—মেলার সময় তা হলে প্যারী গরম হয়ে উঠবে এবার, কি বলো?

—তা আর হবে না? দেশ-বিদেশের রাজা-রাজড়ার দল তো স্ফূর্তি করতেই প্যারীতে আসে।—বললো লুসি।

রোজি বললো—তা ঠিক! রাজা-মহারাজার দল এখানে এসে এমন পাগলের মত টাকা খরচ করে যে, আমরা তাজ্জব হয়ে যাই। আমার পেছনেই তো একবার....

রোজির কথায় বাধা দিয়ে তার স্বামী মঁসিয়ে মিগনন বললো—কি যা তা বলছো সব!

নেশার ঘোরে রোজি ভুলেই গিয়েছিল যে, তার আবার স্বামী আছে। তাই মিগনন কথাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়াতে জিভ্ কাটলো সে।

কেরোলিনা এই সময় ভাঁদেভোকে জিজ্ঞেস করলো—আচ্ছা রাশিয়ার জারের বয়স কত?

কাউণ্ট বললো—সে গুড়ে বালি! জার একেবারে থুরথুরে বুড়ো। মেয়েমানুষ দেখলে এখন আর তাঁর মোটেই পুলক জাগে না।

ভাঁদেভোর এইরকম অশ্লীল মন্তব্যে নানা মনে মনে বিরক্ত হয়ে বললো—এ কি রকম কথাবার্তা চলছে? ছিঃ!

ওদিকে গাগার সঙ্গে লাফ্যালিজের বেশ একটু 'ইয়ে' চলছিল। লা-ফ্যালিজ চুপি চুপি গাগাকে জিজ্ঞাসা করছিল তার বাড়ীর ঠিকানাটা। ব্যাপার দেখে ভাঁদেভো ক্লারিসির হাতে গোপনে একটু চাপ দিয়ে বললো—ঐ ছ্যাখো তোমার হেক্তরের কাণ্ড! বুড়ী গাগার সঙ্গে কি রকম ঢলাঢলি করছে, ছ্যাখো না!

ক্লারিসি আগেই লক্ষ্য করছিল ব্যাপারটা। সে বললো—ও হতভাগা আমার ঘাড় থেকে নামলেই রক্ষে পাই। পয়সার নামে কথাটি নেই, কেবল লম্বা লম্বা বচন! গাগা-ই ওর উপযুক্ত মেয়েমানুষ। কিন্তু তোমার ব্লান্সিও যে বেহাত্ হয়। ঐ ছাখো, বুড়ো মুখপোড়ার সঙ্গে কি রকম ঢলাঢলি করছে ও!

ভাঁদেভো হেসে বললো—তা এই সুযোগে ব্লান্সি যদি টু-পাইস উপরি রোজগার করে নিতে পারে তো করুক না!

এদিকে যখন এইসব কথাবার্তা চলছে, ওদিকে ব্যাঙ্কার ষ্টিনার তখন নানার রূপসুধা পান করে এমনই বে-সামাল হয়ে পড়েছে যে, টেবিলের উপর গ্লাসে যে আসল সুধা পড়ে রয়েছে, সে দিকেও আর খেয়াল নেই তার।

ড্যাবডেবে চোখ দুটো দিয়ে নানার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিটি রেখা, প্রতিটি ভঙ্গিমা, প্রতিটি খাঁজ, বন্ধুরতা —সব কিছুই যেন গিলছিল সে।

শেরি, শ্যাম্পেন, ব্র্যাণ্ডি আর হুইস্কির ফোয়ারা ছুটলো টেবিলের উপর। নাগর-নাগরীদের চোখগুলো নেশায় ঢুলু-ঢুলু হয়ে উঠলো অচিরেই।

হঠাৎ বোর্দেনেভের খেয়াল হলো যে, অভিনেত্রীরা এভাবে মদ গিললে কাল তার থিয়েটারের দফা রফা!

সে তাই নেশাজড়িত কণ্ঠে বলে উঠলো—আর বেশি মদ খেয়ো না, মা লক্ষ্মীরা! কাল অভিনয় করতে হবে, মনে আছে তো?

কিন্তু কে কার কথা শোনে?

সবাই তখন মত্ত।

সম্পাদক মশাই কিন্তু কাজের লোক।

রোজির বেশ একটু নেশা হয়েছে বুঝতে পেরে, সে তার সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করতে সুরু করে দিল!

মদের পরে কফি।

নিয়ম হচ্ছে যে, অতিথিরা উঠে গিয়ে অন্য ঘরে বসে কফি খাবে, কিন্তু বোর্দেনেভ্ হঠাৎ বলে বসলো যে, সে আর এঘর ওঘর করতে পারবে না। কফিটা এখানেই দেওয়া হোক্।

সবাই উচ্চ চীৎকারে সমর্থন জানালো ম্যানেজারকে।

নানার নেশা হলেও একটা বিষয় সে বেশ বুঝতে পারলো যে, অতিথিরা কেউই তাকে সম্মান করছে না।

এই ব্যাপার দেখে নানা নিজেকে অপমানিত মনে করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললো—আজ আমার খুব শিক্ষা হয়ে গেল! আর কোনও দিন পার্টি দিচ্ছি না আমি! আর দিলেও কাকে নিমন্ত্রণ করতে হবে না হবে, তা বুঝে নিলাম।

এই বলে একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললো—আপনারা সবাই জানেন যে, কফি খেতে হলে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে খেতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কি ব্যবহার আপনাদের!

অনেকেই হো হো করে হেসে উঠলো নানার কথা শুনে। কে একজন আবার রসিকতা করে বললো—যা বলেছো মাইরি! কিন্তু কি করি বলো? পা যে আর চলছে না!

কাউন্ট ভাঁদেভো আর ষ্টিনার হঠাৎ নানার সমর্থনে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে বললো—না, এ ঘরে কিছুতেই কফি খাওয়া চলতে পারে না। আসুন আপনারা!

ওদের কথায় কাজ হলো বটে, কিন্তু নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়া ও মহোদয়বৃন্দ এমনই বিশ্রীভাবে ঢলাঢলি আর হাসাহাসি করতে করতে অন্য ঘরে গেল, যাতে নানা নিজেকে চরম অপমানিতা মনে করে ওখান থেকে উঠে চলে গেল।

নানা কোথায় গেল, বা কেন গেল, কেউই সে কথা জিজ্ঞাসা করলো না। সবাই তখন নেশায় মত্ত।

মাতালের দল যে যার নিজের খেয়ালেই ছিল। হঠাৎ ভাঁদেভোর মনে পড়লো নানার কথাঃ "তাই তো! নানা কোথায়?"

সবাই তখন চীৎকার জুড়ে দিল—"নানা কোথায়? নানা কোথায়?"

নানাকে দেখতে না পেয়ে ভাঁদেভো, ড্যাগনেট্ আর জর্জ—তিনজনে ব্যস্ত হয়ে ছুটলো তার শোবার ঘরের দিকে। শোবার ঘরে ঢুকে ওরা দেখলো যে, নানা খাটের উপরে চুপটি করে বসে আছে।

—কি ব্যাপার? ভাঁদেভো বললো—তুমি হঠাৎ উঠে চলে এলে যে?

—চলে আসবো না তো কি বসে বসে মাতালের দলের মাত্লামো দেখবো না কি? এটা কি শুঁড়িখানা পেয়েছে নাকি সবাই? আমি বুঝতে পারছি যে, আজ সবাই মিলে জোট পাকিয়ে আমাকে অপমান করতে এসেছে। এইসব নচ্ছার পাজী ছোটলোকগুলোকে ঝাঁটা-পেটা করে বের করে দেওয়া দরকার!

রাগে আগুন হয়ে নানা আরও কি সব বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু ভাঁদেভো বাধা দেওয়ায় চুপ করে গেল সে।

ভাঁদেভো বললো—চুপ্, চুপ্! কেউ শুনতে পেলে কি মনে করবে? ও রকম কথা বলতে আছে? ছিঃ! হাজার হলেও ওরা সবাই আজ তোমার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত। অতিথিদের সম্বন্ধে ওভাবে কথা বলা রীতিবিরুদ্ধ। তুমি দেখছি বেজায় মাতাল হয়ে পড়েছো! চলো আর ছেলেমানুষি কোরো না।

নানা বললো—কিন্তু তুমি জানো না কাউণ্ট! আজকের এই হট্টগোলের জন্য ঐ হতচ্ছাড়া সম্পাদকটাই দায়ী। আমি ওকে বললাম, কাউণ্ট মাফাত্কে নিমন্ত্রণ করতে। কিন্তু ও সে কথা কাউণ্টকে না বলে, আমার কাছে এসে এক মিথ্যে গল্প বানিয়ে বললো।

—তুমি অযথা রাগ করছো, নানা! ফুচেরি কাউণ্টকে ঠিকই বলেছিল।

—তবে সে এলো না কেন? আমি জানি, কাউণ্টের আমার উপরে নজর পড়েছে, তবুও···

—ওরকম অবুঝের মত কথা বললে চলবে কেন; নানা! কাউণ্ট মাফাত্ কখনও এভাবে সদরে তোমার বাড়ীতে আসতে পারেন?

ভাঁদেভোর কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ বাঘের গর্জনের মত বিকট আওয়াজে চমকে উঠলো সবাই।

নানা তো ভয় পেয়ে একেবারে ড্যাগনেটকে জড়িয়ে ধরে বললো—কিসের শব্দ ওটা !

ওরা তখন লক্ষ্য করে দেখলো যে, নানার বিছানার লেপের তলা থেকেই যেন শব্দটা আসছে।

জর্জ লেপখানা ধরে টান্ মেরে সরিয়ে ফেলতেই দেখা গেল যে, ম্যানেজার বোর্দেনেভ্ দিব্বি আরামে শুয়ে আছে, আর ঘুমের ঘোরে তার নাক দিয়ে বেরুচ্ছে ঐ বিকট শব্দ।

সে যে কোন্ ফাঁকে এসে নানার বিছানায় লেপ-মুড়ি দিয়েছে, তা কেউ জানতেই পারেনি।

বাঘের বদলে থিয়েটারের ম্যানেজারকে দেখে নানা তো হেসেই কুটিপাটি !

তার মনের উপরে অসন্তোষের যে কাল মেঘ জমে উঠেছিল, হাসির দমকা হাওয়ায় সে মেঘ উড়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়লো সূর্যের আলো।

সে তখন খুশী মনে পাশের ঘরে গিয়ে আবার অতিথিদের সঙ্গে হাসি-তামাসা করতে সুরু করে দিল।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল !

একে একে বিদায় নিতে লাগলো নাগর-নাগরীরা।

রোজি আর তার স্বামী মঁসিয়ে মিগনন বিদায় নিয়ে চলে গেল।

গাগাকে নিয়ে লাফ্যালিজ আগেই কেটে পড়েছিল।

ক্লারিসিও অতিথিদের ভিতর থেকে একজনকে জুটিয়ে নিয়ে সরে পড়লো। কেবল টাটান আর নিনি কাউকে না জোটাতে পেরে মনের দুঃখে লা বোর্দেত্‌কে বললো তাদের বাড়ী পর্যন্ত পৌছে দিতে।

ভোরের মিঠেল হাওয়া ছাড়লো।

অবসাদক্লিষ্ট দেহে নেশাজড়িত চোখ দুটি জানালার দিকে মেলে ধরলো নানা।

দূরের কোন ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজছে

পাঁচ

শনিবার।

'ভ্যারাইটি'তে 'ব্লণ্ডি-ভেনাস' নাটকের ত্রিশংতম অভিনয়-রজনীর দিন।

রঙ্গনটী সাইমনি সাজগোজ করে গ্রীনরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল—সাজগোজ ঠিক হলো কিনা!

এই সময় হঠাৎ নটভাস্কর ক্রুলিয়ার কোমরবন্ধে লম্বা এক তলোয়ার ঝুলিয়ে সেই ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলো—এসেছে?

—কে?

—প্রিন্স-দ্য-আকোসি?

—এসেছে বই কি! কোন্ রাত্রিই বা বাদ দেয়?

এই বলে একটু চুপ করে থেকে সাইমনি আবার বললো—নানার এখন বৃহস্পতির দশা চলছে!

এই সময় ক্লারিসি এসে খবর দিল—এসেছেন! প্রিন্স এসেছেন!

হঠাৎ গ্রীণরুমে ম্যানেজারকে দেখা গেল ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটে আসতে। ওদের কাছাকাছি এসে আপন মনেই বললো সে—নানা এখনো এলো না! মহা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি!

সাইমনি ফোড়ন কাটলো—মুশকিল আর কি? নানার তো থিয়েটারে সাত খুন মাপ! নানার জন্য কত বড় বড় রুই-কাত্‌লা আজকাল···

এই সময় নানাকে আসতে দেখে হঠাৎ কথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে সে বললো—এই যে নানা! তোর জন্য ছোট ম্যানেজার যে অস্থির হয়ে যাচ্ছিলো ভাবতে ভাবতে!

নানা পরিহাস করে বললো—তাই নাকি ? ভাবনাটা কি খুব বেশি হয়েছিল নাকি, ম্যানেজার ?

ম্যানেজার বললো—যাও ! তোমার দেখছি সবেতেই ঠাট্টা ! আজ যে প্রিন্স তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন বলে খবর পাঠিয়েছেন, সে খবর রাখো ?

—এত কাণ্ড ! তা কখন সে সৌভাগ্য হবে ?

—তা ঠিক বলতে পারি না।

এই সময় মঁসিয়ে মিগনন হঠাৎ ওখানে এসে নানাকে দেখে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। নানা যেন দেখেও দেখতে পেলো না তাকে—এইভাবে নিজের কামরার দিকে চলে গেল করমর্দন না করেই।

মিগনন এত লোকের মাঝখানে এইভাবে অপদস্থ হয়ে কিছুক্ষণ বোকার মত তাকিয়ে থেকে গ্রীণরুম-ম্যানেজারকে বললো—স্টিনার আসেনি আজ ?

—না তিনি তো প্যারীতে নেই এখন।

—তাই নাকি ! কোথায় গেছে সে ?

—তা ঠিক জানি না। শুনেছি, তিনি নাকি একখানা বাগান-বাড়ী কিনতে বাইরে গেছেন।

—বাগান-বাড়ী ! নানার জন্য বুঝি ?

—তা ছাড়া আর কার জন্যে !

এই কথা শুনে সাইমনি আবার ফুট কাটলো—মাইরি ম্যানেজার ! নানার আজকাল খুব পরতা চলছে !

এই সময় হঠাৎ বোর্দেনেভ্ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে গ্রীণরুম-ম্যানেজারকে ওখানে দেখে রাগে ফেটে পড়লো একেবারে।

সে বললো—তোমার কি আক্কেল বলে কোন পদার্থই নেই নাকি ? তুমি জানো যে, আজ প্রিন্স আসবেন, তবু দেখছি এখানে নোংরা, ওখানে আবর্জনা, এ সব কি ! শীগ্গির সাফ্ করিয়ে ফ্যালো এসব !

এই কথা বলেই যেমনভাবে এসেছিল, ঠিক সেইভাবেই সে ব্যস্ত হয়ে চলে গেল ওখান থেকে।

সে চলে যেতেই গ্রীণরুম-ম্যানেজার তাড়াতাড়ি চাকর ডেকে সাফ-সাফাই সুরু করে দিল।

একটু পরেই কে একজন বলে উঠলো—আসছেন! প্রিন্স আসছেন!

সবাই তটস্থ হয়ে উঠলো এই কথা শুনে।

একজন ভাবী রাজ্যেশ্বর আসছেন স্টেজে—তটস্থ হবার কথাই তো!

ম্যানেজার বোর্দেনেভ্‌কে দেখা গেল পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে মহামান্য অতিথিদের।

প্রিন্স এসে গেলেন!

হ্যাঁ চেহারাখানা রাজা-রাজড়ারই মতই বটে!

যেমন লম্বা, তেমনি বলিষ্ঠ, আর তেমনি সুপুরুষ।

প্রিন্সের সঙ্গে মার্কুইস-দ্য-কুয়ার্দ এবং কাউণ্ট মাফাত্‌-দ্য-বোভাইলও ছিলেন।

ম্যানেজার বললো—এইখানটা একটু দেখে পা ফেলবেন, ইয়োর হাইনেস!

প্রিন্সকে কি বলে সম্বোধন করবে ঠিক করে উঠতে না পেরে একেবারে—'ইয়োর হাইনেস'ই বলে বসলো সে।

প্রিন্স আর তাঁর সহচরদের সঙ্গে ম্যানেজার সোজা নানার সাজ-ঘরের দরজার সামনে নিয়ে গিয়ে বললো—আসুন, 'ইয়োর হাইনেস'! নানা এখানেই আছে।

নানা তখন প্রায় নগ্ন অবস্থায় একখানা ড্রেসিং-টেবিলের সামনে বসে প্রসাধন করছিল। হঠাৎ একদল পুরুষ-মানুষকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর থেকে একখানা তোয়ালে টেনে নিয়ে বুকে চাপা দিয়ে ছুটে গিয়ে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

পর্দার আড়ালে নিজের নগ্ন দেহকে লুকিয়ে একটু রাগতঃ ভাবেই সে শুনিয়ে বললো—আপনার এ কি রকম আক্কেল ম্যানেজার মশাই ? জানেন যে আমি ড্রেস করছি, এ সময় হুট্ করে কি বলে ঢুকে পড়লেন, বলুন তো ?

ম্যানেজার একগাল হেসে বললো—আহ্-হা, চট্ছো কেন ? কে এসেছেন, একবার ছাখো ! 'হিজ হাইনেস' প্রিন্স-হ্য-আকোসি এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

নানা বললো—কিন্তু এ অবস্থায় প্রিন্সের সামনে যাই কি করে বলুন তো ?

নানার ন্যাকামি দেখে হাড়ে চটে গেল ম্যানেজার।

সে বললো—খুব হয়েছে ! এইবার লক্ষীটির মত বেরিয়ে এসো দিকিনি ? তুমি যে সাজছিলে, তা আমিও জানি, আর 'হিজ হাইনেস'ও জানেন ! আড়াল থেকে বেরিয়ে এলে প্রিন্স তো আর খেয়ে ফেলবেন না তোমাকে ?

ম্যানেজারের এই কথায় প্রিন্স হেসে বললেন—তা কিন্তু ঠিক বলা যায় না !

নানা তখন লজ্জার ভান করে বললো—বেশ ! আমি তাহলে এই অবস্থাতেই বের হচ্ছি। প্রিন্স যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

প্রিন্স বললেন—সুন্দরী ! ত্রুটি তোমার নয়, ত্রুটি হয়েছে আমাদের। কিন্তু একমুহূর্ত্তের জন্য হলেও একবার যখন তোমার ঐ অনুপম দেহ-সৌন্দর্য দেখবার সুযোগ আমাদের হয়েছে, তখন সে সাধ আমাদের ভাল করেই মেটাতে দেবে আশা করি।

প্রিন্সের কথা শেষ হইতেই পর্দার আড়াল থেকে বের হয়ে এল নানা।

তার দেহ প্রায় অনাবৃত বললেই হয়।

পরনে যে সিল্কের পায়জামাটা ছিল, সেটা এতই সূক্ষ্ম যে, নানার দেহের প্রত্যেকটি খাঁজ পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছিলো তার ভিতর দিয়ে। তার সুঠাম উন্নত স্তনযুগল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত।

প্রিন্স তো অবাক্ !

এ কী চোখ-ঝলসানো রূপ !

এই অনুপম রূপরাশি যে একমাত্র রাজা-রাজড়াদেরই ভোগের উপযুক্ত !

বুড়ো মার্কুইস আর বিগতযৌবন কাউন্টের অবস্থাও তখন রীতিমত কাহিল।

অভিনেত্রীর প্রসাধন-কক্ষে কাউণ্ট মাফাতের এই বোধ হয় প্রথম পদার্পণ !

নানার নগ্নসৌন্দর্য দেখে কাউন্টের শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তের স্রোত বইতে লাগলো।

তাঁর মনে তখন একমাত্র চিন্তা—"কি করে একে হাত করা যায়! এই সৌন্দর্য! একে যেমন করেই হোক, উপভোগ করতেই হবে।"

ওদিকে বুড়ো মার্কুইসের অবস্থাও তখন রীতিমত সঙ্গীন।

লম্পটরা নাকি বুড়ো হলেই বেশি কামুক হয়। মার্কুইসের দশাও তাই।

এদিকে যবনিকার অন্তরালে যখন এই দৃশ্যের অভিনয় চলেছে, অন্যদিকে প্রেক্ষাগৃহের শত শত দর্শক তখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে নানার জন্য।

এই অঙ্কেই নানার পার্ট, তাই দেরি করবার উপায় নেই তার।

সে তখন বাধ্য হয়ে ওঁদের সামনেই সাজ-পোশাক পরতে সুরু করলো।

আর্কেষ্ট্রা থেমে গেল।

ম্যানেজার বললো—নানা প্রস্তুত ?

নানা বললো—হ্যাঁ।

প্রিন্সের দিকে তাকিয়ে মধুর হাসিতে তাঁকে আপ্যায়িত করে নানা বললো—আমাকে যে এখনই স্টেজে যেতে হবে, প্রিন্স !

প্রিন্স বললেন—থিয়েটার শেষ হলে আমার সঙ্গে দেখা না করে পালিও না কিন্তু ?

নানা মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ছয়

যাঁরা ভূলেও কোনদিন শহর থেকে দূরে যেতে চান না, সেই সব সেরা বিলাসীর হঠাৎ পল্লীবাসের উপরে আসক্তি গজিয়ে উঠেছে দেখে মাদাম হিউজেন তো ভেবেই অবাক্! অবাক্ হবার কথাই তাঁর। কারণ, এতদিন যে সব হোমরা-চোমড়ার দল তাঁকে ডেকেও একটি কথা জিজ্ঞাসা করতেন না, তাঁরাই হঠাৎ মাদামের বাড়ীতে এসে তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা করতে লেগে গেছেন।

মাদাম হিউজেনের বাড়ীটা ছিল শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে, অর্লিয়ান্স গ্রামের প্রান্তে। প্যারী থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে পুরো একদিন লাগে এই গ্রামে আসতে।

মাদাম বিধবা। অবস্থা খুব সচ্ছল না হলেও মোটামুটি অভাব ছিল না তাঁর সংসারে। তাঁর দুই ছেলে—ফিলিপ আর জর্জ। ফিলিপ সেনা-বিভাগের একজন অফিসার আর জর্জ স্কুলের ছাত্র।

মাফাত্-পরিবারের সঙ্গে মাদাম হিউজেনের বহুদিনের পরিচয়। কাউণ্টেস স্যাবাইনও তাঁর বিয়ের আগে অনেকদিন কাটিয়ে গেছেন মাদাম হিউজেনের এই পল্লীভবনে।

সেই পুরানো পরিচয়ের সূত্র ধরেই কাউণ্ট মাফাত্ সপরিবারে হাজির হয়েছেন মাদামের বাড়ীতে। তা ছাড়া 'ফিগারো'-সম্পাদক মঁসিয়ে ফুচেরি এবং ড্যাগ্নেটও এসে জুটেছে জর্জের নিমন্ত্রণে।

কাউণ্ট ভাঁদেভোও নাকি অনেকদিন থেকেই আসবো আসবো করছিলেন, কিন্তু নানা কাজের ঝঞ্চাটে এতদিন আসতে পারেন নি। তিনিও তাই একদিন হঠাৎ এসে হাজির।

ব্যাপার কি!

মাদাম হিউজেন ভেবেই কূল পান না যে, হঠাৎ তাঁর প্রাধান্য অতোটা বেড়ে গেল কেন?

*   *   *   *   *

মঁসিয়ে ষ্টিনার নানাকে যে বাড়ীখানা কিনে দিয়েছিলেন, সে বাড়ীখানাও ছিল এই গ্রামেই। মাদাম হিউজেনের বাড়ী থেকে নানার বাড়ী খুব বেশি দূরে নয়।

কিছুদিন হয় নানা থিয়েটারের কাজ ছেড়ে দিয়ে এই নূতন বাড়ীতে উঠে এসেছিল।

নানার বাড়ীখানা দোতলা।

উপরে পাঁচখানা আর নীচে পাঁচখানা ঘর। উপরের ঘরগুলোকে যথাসম্ভব পরিপাটি করে সাজিয়েছিল সে।

বাড়ীটার সামনে পেছনে দুদিকেই রাস্তা। রাস্তা থেকে বাড়ীতে ঢুকতেই গেট। গেট পার হলেই চমৎকার ফুলের বাগান। বাগানে রকমারী গোলাপ এবং অন্যান্য অসংখ্য ফুল ফুটে থাকে সব সময়। বাড়ীর পেছনদিকে সবজির চাষ করা হয়েছিল। এ ছাড়া ফলের বাগানও ছিল একদিকে। ফলের বাগানে আম, জাম, লিচু, আপেল, ন্যাসপাতি, কমলালেবু প্রভৃতি বহুরকম ফলের গাছ ছিল।

বাড়ীখানা নানার খুবই পছন্দ হয়েছিল। এইরকম একখানা বাড়ী কিনে দেওয়ায় মঁসিয়ে ষ্টিনার তখন হয়ে উঠেছিল নানার সবচেয়ে পেয়ারের লোক।

বেঁটে ব্যাঙ্কারের সে কী আনন্দ! কাজকর্ম চুলোয় দিয়ে সে এখন নানার বাড়ীতেই পড়ে থাকে।

এদিকে লোকের মুখে মুখে "নানা এই গাঁয়ে এসেছে"—এই খবরটা রটে যাবার পর থেকেই দলে দলে লোক নানার বাড়ীর আশে পাশে ঘুর-ঘুর করতে আরম্ভ করে দিল।

জর্জ ছোকরা তো খবরটা শোনা অবধি কি করে নানার সঙ্গে একবার দেখা করবে, সেই চিন্তাতেই অস্থির। তার সব চেয়ে ভয় মাকে। মা যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন যে, নানার সঙ্গে তার পরিচয় আছে, তা হলে আর রক্ষা থাকবে না।

অনেক ভাবনা-চিন্তা করে জর্জ এক মতলব বের করলো। সে সেদিন অসুখের ভান করে মাকে গিয়ে বললো—আমার বড্ড শরীর খারাপ করেছে, রাত্রে আর কিছু খাব না আজ।

মাদাম হিউজেন ব্যস্ত হয়ে উঠে ছেলের কপালে হাত দিয়ে দেখে বললেন—কৈ, গা তো গরম হয়নি? তবুও সাবধান হওয়া ভালো। তুমি বরং ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।

জর্জও তাই চাইছিলো। সে বললো—বেশ! আমি তা হলে দোর বন্ধ করে শুয়ে পড়ছি। আজ আর আমাকে ডেকো না তোমরা।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল।

আঁধার একটু বেশি হতেই জর্জ খাটের নীচে থেকে একগাছা দড়ি বের করে জানালা গলিয়ে নীচে ফেলে দিল। তারপর সেই দড়ির প্রান্তটা খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে জানালা দিয়ে সেই দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে বাড়ীর পেছনের বাগানের মধ্যে নেমে পড়লো।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল তখন।

বৃষ্টিতে ভিজে জর্জের জামা-কাপড় একেবারে সপ্‌সপে হয়ে গেল।

জর্জের কিন্তু সেদিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ নেই। সে সেই ভিজে জামা-কাপড়েই নানার বাড়ীতে গিয়ে হাজির।

কিন্তু বাড়ীর সামনে এসে নীচের ঘরে উজ্জ্বল আলো আর অনেক লোকজন দেখে ঘাবড়ে গিয়ে সে বাড়ীর পিছনদিকে চলে গেল। অনেক চেষ্টায় পিছনের পাঁচিল টপকে পূর্বোক্ত সেই ফলের বাগানের ভিতরে পড়লো সে।

দোতলায় নানার ঘরে তখন আলো জ্বলছিলো। জর্জ সেই আলোক লক্ষ্য করে পাইপ বেয়ে জানালার কার্ণিশের উপর উঠে দাঁড়াতেই নানার দৃষ্টি পড়লো তার দিকে।

হঠাৎ জানালায় মানুষের মাথা দেখে চোর মনে করে নানা চীৎকার করে উঠতে যাবে, এইসময় জর্জ বলে উঠলো—তুমি চেঁচিও না। আমি!

—আমি! আমি কে?

—আমি জর্জ!

—জর্জ! তা তুমি এখানে কেন? শীগ্‌গির এসো ভিতরে।

নানার আহ্বানে জর্জ সেই জানালা গলে ঘরের ভিতরে লাফ দিয়ে পড়েই উন্মত্ত আবেগে জড়িয়ে ধরলো নানাকে।

সে সেই ভিজে জামাকাপড়েই নানাকে জাপটে ধরে তার মুখে আর গালে চুমোর পর চুমো দিতে লাগলো।

অপ্রাপ্তবয়স্ক এই কিশোরটিকে নানা মনে মনে একটু স্নেহ করতো, তাই সে কিছুটা শাসনের স্বরেই বললো—কী ছেলেমানুষি করছো জর্জ! খবর নেই, বার্তা নেই, এরকম করে জলে ভিজে, চোরের মতন জানালা দিয়ে কেউ আসে? ভাগ্যিস্ কেউ দেখতে পায়নি! মালীরা দেখলে কি হতো বলো তো?

জর্জ বললো—অতো সব ভেবে দেখবার সময় ছিল না। তুমি এসেছ—এই খবর শোনা অবধি আমি পাগলের মত চেষ্টা করেছি, কি করে একবার দেখা করতে পারি তোমার সঙ্গে।

নানা বললো—তা বেশ করেছো। এইবার লক্ষ্মী ছেলেটির মত ভিজে জামা-কাপড়গুলো ছেড়ে ফেল দেখি। আলনা থেকে আমার একটা গাউন নিয়ে পরে ফেলো।

* * * * *

এইরকম অপ্রত্যাশিতভাবে কিশোর জর্জকে শয্যা-সঙ্গী পেয়ে খুশীই হলো নানা। এই কিশোরের ভালবাসায় ছিল একটা মধুর আবেগ।

সারারাত নানার সঙ্গে এক বিছানায় কাটিয়ে শেষরাত্রে বাড়ী চলে গেল জর্জ। বাড়ীতে ফিরে সে আবার সেই দড়ি ধরে নিজের ঘরে ঢুকেই একেবারে লেপের তলায়।

পরদিন ঘুম থেকে উঠতে অনেক বেলা হয়ে গেল জর্জের।

মাদাম হিউজেন ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—চোখ-মুখ বসে গেছে দেখছি যে! শরীর কেমন আছে জর্জ?

জর্জ বললো—একটু ভালো।

এর পর প্রতি রাত্রেই চললো মাকে লুকিয়ে জর্জের প্রণয়লীলা।

জর্জ যখন চুটিয়ে প্রেম করছে নানার সঙ্গে, মাদাম হিউজেনের বাড়ীখানা তখন ভরতি হয়ে গেছে অতিথি-সমাগমে।

ওখানে তখন কাউণ্ট মাফাত্, ড্যাগনেট, ভাঁদেভো আর সম্পাদক ফুচেরি রীতিমত জেঁকে বসেছে। সবাই কোন না কোন বিশেষ কাজে এসেছে বলে বললো মাদামকে। কাউণ্ট মাফাত্ বললেন যে, তিনি নাকি বিশেষ কোন সরকারী কাজে এসেছেন। আসলে তাঁর এই বিশেষ কাজটি ছিল কিন্তু নানার বাড়ীতে যাতায়াত।

নানাও এইসময় তার চারে বড় বড় মাছ এসেছে দেখে, রীতিমত খেলিয়ে তুলতে সুরু করেছে এক-একটাকে।

কাউণ্ট মাফাত্কেই খেলাতে লাগলো সবচেয়ে বেশি করে। সে ভাল করেই জানতো যে, পুরুষমানুষের যদি কোন মেয়ের প্রতি যৌন আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে, তা হলে সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়া অবধি সে একেবারে ক্ষেপে যায়।

কাউণ্ট মাফাতের দশাও ঠিক তাই!

ওদিকে কাউণ্টের অনুপস্থিতির সুযোগে সম্পাদক মশাই আবার কাউণ্টেস স্যাবাইনের সঙ্গে রীতিমত জমিয়ে ফেলেছে। তা ছাড়া, ড্যাগনেটকেও দেখা গেল সব সময় এস্টেলের পিছনে পিছনে ঘুরতে। ড্যাগনেট ভাবলো যে, কোন

গতিকে যদি সে এই কাউন্ট-নন্দিনীকে বিয়ে করতে পারে, তা হলেই কেল্লা ফতে।

এদিকে যখন এইভাবে পাইকারী হারে প্রেম চলেছে, ওদিকে নানার বাড়ীতেও তখন একেবারে 'নরক গুলজার'। প্যারী থেকে নানার থিয়েটারের বন্ধু-বান্ধবীরা দল বেঁধে এসে হাজির হয়েছে নানার বাড়ীতে।

লা-বোর্দেত্, হেক্‌তর, গাগা, গাগার মেয়ে এমেলি, লুসি, কেরোলিনা, টাটান্, নিনি এবং আরও অনেকে এসে জুটেছে তখন নানার বাড়ীতে।

এইসব বন্ধুদের পেয়ে খুশীই হলো নানা।

সে যে এখন সামান্য 'ব্যালে-গার্ল' নয়, এই কথাটা ভালো করে বুঝিয়ে দিতে সেদিন বিরাট রকমের ভোজই দিয়ে ফেললো নানা।

শনিবার।

—রোব্‌বারের দিনটা একটু আনন্দ করে কাটালে কেমন হয়? প্রস্তাব করলো হেক্‌তর।

প্রস্তাবটা নানারও খুব মনঃপূত হলো।

সে বললো—চমৎকার প্রস্তাব! চলো, আমরা সবাই মিলে কাল পাহাড়ে গিয়ে চড়ুইভাতি করে আসি, কেমন?

লুসি বললো—এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব আর কিছু হ'তেই পারে না!

লা-বোর্দেত্ বললো—ঠিক ঠিক! ওখান থেকে ফিরবার পথে 'অ্যাবি-হু-চ্যামণ্ট'-এর প্রাচীন সৌধগুলির ধ্বংসাবশেষও দেখে আসা যাক, কি বলো?

'অ্যাবি-হু-চ্যামণ্ট' জায়গাটা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

এদিকে কাউণ্ট মাফাতের অবস্থা তখন রীতিমত সঙ্গীন। এতো লোকের সামনে নানার বাড়ীতে ঢোকা তাঁর পক্ষে কঠিন। কারণ জানাজানি হয়ে গেলে একেবারে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে। বাধ্য হয়েই তাই মনের আশা মনেই লুকিয়ে রাখলেন কাউণ্ট।

নৈশভোজ শেষ করে বন্ধু-বান্ধবীদের কাছে বিদায় নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকতেই নানা দেখলো যে, জর্জ ছোক্‌রা কোন্ ফাঁকে এসে বিছানায় শুয়ে আছে।

জর্জের কাছে নানা তার খিড়কি-দরজার চাবি দিয়ে রেখেছিল। ঐ চাবির সাহায্যেই জর্জ প্রতি রাত্রে অন্যের অলক্ষ্যে পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢুকে সোজা নানার শয়নকক্ষে চলে আসতো।

বিছানায় শুয়ে জর্জকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে নানা বললো—কাল আমাদের পিক্‌নিক্ হবে পাহাড়ে, তুমি যাবে তো?

জর্জ দেখলো মহা বিপদ!

নানার সঙ্গে পিক্‌নিক্ করতে গেলে যদি কেউ দেখে ফেলে, তা হলেই তো হয়েছে!

সে তখন নানাকে অনুরোধ করলো তাকে রেহাই দিতে, কিন্তু নানা কিছুতেই স্বীকার করলো না।

অগত্যা জর্জকে স্বীকার করতেই হলো যে, সে-ও যাবে।

সাত

রবিবার।

দিনটা পরিষ্কার দেখে সকালবেলাকার খানার টেবিলেই মাদাম হিউজেন এক লোভনীয় প্রস্তাব করে বসলেন। তিনি বললেন—আজ সবাই মিলে পাহাড়ের দিকে বেড়াতে গেলে কেমন হয় ?

সবাই একবাক্যে সমর্থন করলো এই চমৎকার প্রস্তাব।

কাউণ্ট মাফাত্ বললেন—তাহলে আর দেরি করে কাজ কি ? চলুন, এখনই বেরিয়ে পড়া যাক্ !

কাউণ্টের কথায় সবাই সম্মতি জানালো।

ঠিক হলো যে, খাওয়া শেষ হলেই বেরিয়ে পড়বেন ওঁরা।

যাবার মুখে ফুচেরি বললো—জর্জ কোথায় ? তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না ?

মাদাম হিউজেন বললেন—ওর শরীরটা ভাল নেই ; বোধ হয় ঘরে শুয়ে আছে।

ফুচেরি আর কোন কথা না বলে কাউণ্টেসের সঙ্গে গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলো।

দু'খানা গাড়ী করে রওনা হলেন ওঁরা।

ওঁদের গাড়ী দু'খানা যখন একটা পুলের কাছাকাছি এসেছে, সেই সময় ওঁরা লক্ষ্য করলেন যে, আরও একদল ওঁদের আগেই এসে পুলের মুখ বন্ধ করে তাদের গাড়ীগুলোকে দাঁড় করিয়েছে। আগের দলের লোকগুলো বিশ্রীরকম হল্লা আর চেঁচামেচি করছিল গাড়ীতে বসে।

মাদাম হিউজেন বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন—ওরা আবার কারা? পুলটাকে একেবারে বন্ধ করে রেখেছে দেখছি!

এইসময় কাউন্ট ভাঁদেভো সামনের গাড়ীগুলোর দিকে তাকিয়ে নানাকে দেখতে পেয়ে সবিস্ময়ে বলে উঠলো—এ যে দেখছি নানার দলবল!

মাদাম হিউজেন বললেন—কি আপদ! চলো, আমরা ওদের পাশ কাটিয়ে বের হয়ে যাই।

কিন্তু বললে কি হয়! ওদের গাড়ীগুলো এমনভাবে পথ জুড়ে ছিল যে, পাশ কাটিয়ে যায় কার সাধ্য।

নানার দলের প্রথম গাড়ীতে ছিল মেরি ব্লণ্ড, টাটান আর নিনি।

তার পেছনের গাড়ীখানায় ছিল গাগা আর তার নূতন নাগর হেক্তর।

গাগার গাড়ীর পেছনের গাড়ীতে ছিল লা-বোর্দেত্, কেরোলিন, লুসি, রোজি, আর তার ছোট ছেলে এবং সবার পেছনের গাড়ীখানায় ছিল নানা, স্টিনার আর মাদাম হিউজেনের ছোট তনয় জর্জ।

নানার দিকে ইশারা করে কাউন্টেস্ সম্পাদক সাহেবের হাতে একটু চাপ দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন—ইনিই বুঝি তিনি?

ফুচেরি বললো—হ্যাঁ।

পেছনের গাড়ী দু'খানা সামনের গাড়ীগুলোর কাছে এসে পড়লো।

এই সময় মাদাম হিউজেনের নজর পড়লো নানার গাড়ীর দিকে।

নানার গাড়ীতে জর্জকে বসে থাকতে দেখে, তিনি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

আগের গাড়ীগুলো একটু পাশ করে জায়গা দিতেই পেছনের গাড়ীগুলো পাশ কাটিরে বেরিয়ে যেতে লাগলো।

মাদাম হিউজেন লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর পুত্ররত্নটি একেবারে নানার গা ঘেঁষে বসে আছে।

কাউণ্ট মাফাত্ অলক্ষ্যে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ষ্টিনারকে নানার গাড়ীতে দেখে।

মাকু ইস্-ত্ত-কুয়ার্দ রাস্তার পাশের একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়ে নিয়ে অন্যমনস্ক-ভাবে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

ভাঁদেভো লুসির দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে কি যেন বলে নিলো এক ফাঁকে।

এদিকে যখন এইসব ব্যাপার চলেছে, ওদিকে লুসি তখন গলা বাড়িয়ে ষ্টিনারকে জিজ্ঞাসা করছিল—ঐ লম্বামত মেয়েছেলেটি কে, ব্যাঙ্কার ?

—উনিই তো কাউণ্টেস্ স্যাবাইন !

এই কথা শুনে নানা একবার দেখে নিল কাউণ্টেস্‌কে। দেখা হয়ে গেলে বললো—উনিই তিনি ? আমি তো তা হলে ঠিকই অনুমান করেছিলাম।

—কি অনুমান করেছিলে বলো তো ? জিজ্ঞাসা করলো ষ্টিনার।

নানা বললো—তোমাদের কাউণ্টেস্‌টি ইদানিং সম্পাদক সাহেবের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

—বলো কি !

—তার বলি কি ! উনি কাউণ্টেস্‌ই হোন, আর যা-ই হোন, মেয়েমানুষ হিসাবে উনি আমাদেরই স্বগোত্রের।

হঠাৎ জর্জের দিকে দৃষ্টি পড়লো নানার। ভয়ে বেচারার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল মাকে দেখে। বাড়ী গিয়ে মাকে কি বলবে, এই ভাবনাতেই সে অস্থির হয়ে উঠেছিল।

ওর অবস্থা দেখে দুঃখ হ'লো নানার।

সে বললে—তুমি খুব ঘাবড়ে গেছ, তাই না ?

জর্জ তার দু'চোখের ভয়ার্ত দৃষ্টি দিয়ে নানার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই আবার মাথা নত করলো। মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হ'ল না তার।

নানা তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করতে লাগলো। সে বললো—আমার জন্যই দেখছি তোমার এই অবস্থা। তোমাকে সঙ্গে না আনলেই ভাল হতো। যাক্‌গে, যা হবার, তা তো হয়েছে; আমি বরং বাড়ীতে গিয়ে তোমার মায়ের কাছে একখানা চিঠি লিখে দেবো'খন যে, তোমার কোনই দোষ নেই, আজই প্রথম ষ্টিনার তোমাকে সঙ্গে করে আমার এখানে নিয়ে এসেছে।

জর্জ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠলো—না না, ও সব তুমি করতে যেয়ো না, মাকে যা বলতে হয়, সে আমিই যাহোক্ একটা বানিয়ে বলবো'খন। তবে যদি বেশি গোলমাল করে, তাহলে তোমার এখানেই চলে আসবো আমি।

মুখে জর্জ একথা বললো বটে, কিন্তু মনে মনে তার ভীষণ ভয় হ'তে লাগলো। বাড়ীতে গিয়ে কি বলে সবার সামনে মুখ দেখাবে, এই চিন্তাতেই অস্থির হয়ে উঠলো সে।

জর্জ বেচারার অবস্থার কথা ভেবে নানার মনটাও খারাপ হয়ে গেল। সে তখন কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা করলো—আর কতদূর হে কোচম্যান?

—এই যে এসে পড়লাম বলে। ঐ যে সামনে বাগানবাড়ীটা দেখছেন? ঐ বাড়ীটা ছেড়ে গেলেই 'অ্যাবি-দ্য-চ্যামণ্ট'-এর ধ্বংসাবশেষ।

নানা জিজ্ঞাসা করলো—ও বাগানবাড়ীটা কার?

কোচমান বললো—ওটা হচ্ছে মাদাম-দ্য-অ্যাংলার্স-এর বাগান-বাড়ী।

মাদাম এ্যাংলার্সের বাড়ীখানা পেরিয়ে কিছুটা যেতেই একটা ধ্বংসস্তূপ দেখতে পাওয়া গেল। নানার গাড়ীর কোচম্যান বললো—ঐ দেখুন, অ্যাবি-দ্য-চ্যামণ্টের ধ্বংসাবশেষ।

নানা ধ্বংসস্তূপটার দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে দেখে বললো—ও আমার কপাল! এই সেই ইতিহাসবিখ্যাত জায়গা! এই জায়গারই এত নামডাক! এর চেয়ে তো তোমার ঐ মাদাম কি যেন বললে, তাঁর বাগান-বাড়ীটাও অনেক ভালো!

কোচম্যান বললো— তা আর হবে না! কতবড় নামকরা মহিলা উনি! সম্রাট নেপোলিয়নের আমলে কত বড় বড় রাজা-রাজড়াও ওঁকে খাতির করতেন!

লুসি এইসময় জিজ্ঞাসা করলো—কি নাম বললে মেয়েমানুষটার?

কোচম্যান বললো— মাদাম-স্থ-অ্যাংলার্স।

গাগা এইসময় হঠাৎ বলে উঠলো—ইরণা-স্থ-অ্যাংলার্সের কথা বলছো নাকি?

কোচম্যান বললো—হ্যাঁ।

গাগা বললো—তাঁকে তো আমি খুব চিনি। ছেলেবেলায় আমরা প্রায়ই তাঁকে গাড়ী করে যেতে দেখতাম।

নানা বললো—তা হলে চলো, আজ বরং তোমাদের ঐ মাদাম ইরণার বাড়ীখানাই দেখে ফেরা যাক। এই ভাঙা ইটের পাঁজায় নামবার মোটেই ইচ্ছে নেই আমার।

নানার কথা-মতই কাজ হ'লো।

গাড়ীগুলোকে ঘুরিয়ে মাদাম অ্যাংলার্সের বাড়ীর দিকে নিয়ে যেতে বলা হ'লো।

ওখানে যেতে বেশি দেরি হলো না ওদের। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাদামের বাড়ীর সামনে এসে গেল ওরা।

চমৎকার বাড়ীখানা!

বাড়ীর ফটক থেকেই স্থরু হয়েছে লাল স্থরকির চওড়া রাস্তা। রাস্তাটার দু'ধারে বড় বড় গাছের সারি। দু'ধারে ফুলের বাগান। কাঁটাগাছের বেড়া দিয়ে বাড়ীর কম্পাউণ্ড ঘেরা। গাছগুলো ছেঁটে একেবারে পাঁচিলের মত করে রাখা হয়েছে।

এইসময় মাদাম অ্যাংলার্সকে দেখা গেল বাড়ী ফিরতে। পাড়ার অনেক মেয়ে-পুরুষ সঙ্গে আসছিল তাঁর। একটা ছাই-রঙের সিল্কের পোশাক পরেছিলেন তিনি।

নানা লক্ষ্য করলো যে, গ্রামের লোকেরা সবাই ওঁকে খুব সমীহ করে চলেছে।

মিগ্নন তার ছেলেকে বললো—দেখেছিস্ খোকা! ভাল লোককে লোকে কত সম্মান করে?

লা-বোর্দেত্কে বলতে শোনা গেলো—মেয়েমানুষটা বুড়ো হয়েছে, কিন্তু চেহারাখানা কেমন রেখেছে দেখেছো? আর একজন টিপ্পনি কাটলো—তা হবে না! বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী যে!

লুসি হঠাৎ গরম হয়ে উঠলো মাদাম অ্যাংলার্সের সম্বন্ধে এই রকম অশিষ্ট মন্তব্য শুনে। সে বললো—তোমরা দেখছি মানী লোকের মান রেখে কথা বলতেও জানো না। ছিঃ!

মাদাম অ্যাংলার্সকে দেখে আর যে যা-ই মনে করুক, নানার কিন্তু মনে ভাবান্তর এসে গেল। সে ভাবলো যে, ইচ্ছা করলে সে-ও তো ওঁর মত ভাল হতে পারে।

মনের এই ভাবান্তর নিয়েই নানা বাড়ীতে ফিরলো সেদিন। বাড়ীতে এসেই সে জো-কে বললো—আমি কালই প্যারীতে ফিরে যাবো। তুই জিনিসপত্র সব আজই গুছিয়ে রাখ্, বুঝলি?

জো-ও প্যারীতে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, তাই নানার কথা শুনে খুশীই হলো সে মনে মনে।

আট

নানা সেই পল্লী-ভবন থেকে ফিরে আসবার তিনমাস পর একদিন রাত প্রায় এগারটার সময় কাউণ্ট মাফাত্‌কে দেখতে পাওয়া গেল ভ্যারাইটি থিয়েটারের সামনের রাস্তায় পায়চারি করতে। বলা বাহুল্য, নানার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন তিনি। ঐ দিন বিকেলে নানার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছিলেন যে, তিনি যেন সেদিন না আসেন তার বাড়ীতে ; কারণ, সে তার ছেলেকে দেখতে যাবে। কাউণ্টের কিন্তু বিশ্বাস হয় নাই একথা। তাঁর ধারণা যে, নানা তাঁকে ভাঁওতা দিয়েছে।

রাস্তায় পায়চারি করতে করতে কত কথাই মনে হচ্ছিল তাঁর। এই তিনমাসে নানার জন্য তিনি কি কিছুই করেন নাই ? নানা যখন যা আব্দার করেছে, তখনই তার সে আব্দার তিনি পূর্ণ করেছেন। নিজের মানসম্ভ্রম, এমন কি বংশগৌরব পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়ে নানার পিছনে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নানার মুখের একটু হাসি, একটু সোহাগের কথা, একটুখানি আদর পাবার আশায় জলের মত টাকা খরচ করেছেন তিনি। আর সেই নানা কিনা আজ মিথ্যেকথা বলে দূরে রাখতে চাইছে তাঁকে!

মনে মনে রাগও হচ্ছিল তাঁর। তিনি মনস্থ করলেন যে, আজ নানার সঙ্গে দেখা করে একটা হেস্তনেস্ত করবেন তিনি। হঠাৎ তাঁর লক্ষ্য পড়লো, আরও একটি লোক থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়ে বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। লোকটাকে দেখে পয়সাওয়ালা বলেই মনে হলো কাউণ্টের। লোকটাকে নানার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে, কাউণ্টের মনের মধ্যে ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠলো।

একবার তিনি ভাবলেন যে, গ্রীনরুমে গিয়ে নানার সঙ্গে দেখা করবেন, কিন্তু থিয়েটার ভাঙবার সময় হয়ে এসেছিল বলে আর ভিতরে গেলেন না তিনি।

একটু পরেই থিয়েটার ভাঙলো।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে নানাকে বাইরে আসতে দেখলেন তিনি।

ভিড় ঠেলে নানার দিকে এগিয়ে গেলেন কাউণ্ট।

হঠাৎ তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়ায় নানা যেন বিব্রত হয়ে উঠলো বলে মনে হ'লো তাঁর।

নানা জিজ্ঞাসা করলো—কি ব্যাপার! তুমি এখানে?

কাউণ্ট নানার প্রশ্নের কোনই উত্তর দিলেন না দেখে নানা তাঁর কাছে এসে বললো—রাগ করেছো? চলো, তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি আমি।

এই কথা বলেই কাউণ্টের দিকে হাত এগিয়ে দিল নানা। কাউণ্ট নানার সেই প্রসারিত হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বিজয়ী বীরের মত তাকালেন সেই লোকটার দিকে। লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল ওখানে।

নানাকে পরহস্তগত দেখে লোকটা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ওখান থেকে চলে গেল।

কাউণ্টের মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটলো আবার।

কাউণ্ট বললেন—কোথায় যেতে চাও এখন?

নানা বললো—কেন! আমার ওখানে?

—তা হলে গাড়ী নেওয়া যাক্, কেমন?

—না, চলো আজ হেঁটেই যাই। বেশ লাগছে হাঁটতে।

নানার ভাল লাগছে,—এর উপরে আর কথাই চলতে পারে না। নানার নরম হাতের উষ্ণ স্পর্শে সব কিছু ভুলে গেলেন কাউণ্ট।

রাস্তার দু'ধারে সুসজ্জিত বিপণি-শ্রেণী।

দোকানগুলোর দিকে তাকিয়ে নানার মনে হ'লো ছেলেবেলার কথা। কতদিন সে এইসব দোকানের সামনে দিয়ে হেঁটেছে!

ছেলেবেলায় যখন সে ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে ভিখিরী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভিক্ষা করে বেড়াতো এই রাস্তায়, তখনকার দিনের কথা মনে হ'লো তার। এই সব দোকানের দিকে তাকিয়ে তখন সে ভাবতো—"যদি কোন ভদ্রলোক তাকে দু'খানা বিস্কুট কিনে দিত!"

ছেলেবেলাকার সেই দুঃখের দিনের কথা মনে আসতে নানার মনটা কেমন যেন হয়ে গেল।

সে কাউণ্টকে বিদায় করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কাউণ্টের সাহচর্য মোটেই ভাললাগছিল না তার।

সে বললো—তুমি এখন তোমার বাড়ী যাবে তো?

কাউণ্ট বললেন—না, আমি তোমার ওখানেই যাবো।

নানা বিরক্ত হলো কাউণ্টের কথা শুনে। সে ভাবলো, লোকটা যেন ছিনে জোঁক। ও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে যে, আমি ওকে বিদায় করতে চাইছি। কিন্তু তবুও পেছন ছাড়ছে না আপদটা!

'কাফে আল্পস'-এর সামনে দিয়ে যেতে যেতে নানা হঠাৎ বলে বসলো—ভয়ানক খিদে পেয়েছে আমার, চলো এখান থেকে কিছু খেয়ে নিই।

এই বলেই কাফের ভিতরে ঢুকে পড়লো নানা।

নানার কোন কাজে বাধা দেবার ক্ষমতা কাউণ্টের ছিল না, তাই ইচ্ছে না থাকলেও নানার সঙ্গে কাফেতে ঢুকে পড়লেন কাউণ্ট।

কাফের ভিতরটা তখন জমজমাট। প্রায় প্রত্যেক টেবিলেই কেউ না কেউ বসে। নানা হলঘরের ভিতর দিয়ে সোজা হেঁটে গিয়ে একটা প্রাইভেট চেম্বারে ঢুকতে যাবে, এমন সময় পাশের চেম্বার থেকে কোন চেনা লোকের হাসির আওয়াজ শুনতে পেলো সে।

কাউণ্টকে কামরায় অপেক্ষা করতে বলে নানা পাশের চেম্বারটার সামনে গিয়ে হাত দিয়ে দরজাটা ঠেলে খুলে ফেলতেই ভিতর থেকে নিতান্ত পরিচিত কণ্ঠে কে বলে উঠলো—কি আশ্চর্য! নানা যে?

কথাটা বলেছিল ড্যাগনেট।

নানা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে দেখে ড্যাগনেট আবার বললো—আরে! দাঁড়িয়ে রইলে যে? ভিতরে এসো!

নানা বললো—না, আমরা পাশের কামরায় আছি। কাউণ্ট সঙ্গে আছে যে!

ড্যাগনেট বললো—তা আর থাকবে না? তোমার তো এখন ঐ সব মার্ক্ইস আর কাউণ্টদের সঙ্গেই কাজ-কারবার। আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের কথা কি আর মনে আছে তোমার?

—চুপ! শুনতে পাবে যে!

—পেলেই বা। আমি কি ওকে ভয় করি নাকি? তা ছাড়া, ওর ঘরের খবর জানতেও তো আমার বাকী নেই।

—ওর আবার ঘরের কি খবর?

—ও হরি! তাও জানো না বুঝি? ওর স্ত্রীটি যে আমাদের সম্পাদক সাহেবের সঙ্গে একেবারে লেপ্‌টে গেছেন।

—তাই নাকি?

—আর তাই নাকি! আজও তো তোমার ঐ কাউণ্ট মশাইর ধর্মপত্নী সম্পাদক সাহেবের ঘরে রাত কাটাচ্ছেন। ইচ্ছে হলে দেখেও আসতে পারে ও।

নানা বললো—খবরটা জানিয়ে উপকার করলে। উৎপাতটাকে আমি তাড়াবার ফিকির খুঁজছিলাম, কিন্তু লোকটা যেন ছিনে জোঁক। কিছুতেই ছাড়তে চায় না। আজ যাদুকে এমন নুনের ছিটে দেবো যে, পালাতে পথ পাবে না। আচ্ছা, আমি তা হলে চলি, কেমন?

এই বলেই নানা ওখান থেকে চলে গেল। কাতখন কামরায় বসে উণ্ট আঙুল কামড়াচ্ছিলেন।

নানাকে দেখে কাউণ্ট একটু বিরক্তভাবেই বললেন—ছ্যাখো নানা, আমার সঙ্গে যখন রাস্তাঘাটে চলাফেরা করবে, সে সময়টা যার তার সঙ্গে আলাপ কোরো না। জান তো, আমার একটা প্রেষ্টিজ আছে!

নানা এই কথায় অপমানিত বোধ করে বললো—তা তো বটেই! তুমি তা হলে বরং আমার সঙ্গে মেলামেশা ছেড়ে দাও।

কাউণ্ট দেখলেন যে, কথাটা বলে মহাবিভ্রাট বাধিয়ে ফেলেছেন তিনি। তাই তিনি নানাকে খুশী করবার জন্যে একথা সে কথা বলে তাকে ভোলাতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

খেতে বেশি দেরি হলো না ওদের।

খাওয়া হয়ে গেলে নানা আর একবার চেষ্টা করলো কাউণ্টকে বিদেয় করতে। কিন্তু সে কিছুতেই যাবে না দেখে, অগত্যা বাড়ীতেই নিয়ে চললো তাকে সঙ্গে করে।

বাড়ীতে এসে বসে নানা বললো—আজকের 'ফিগারো' পত্রিকাখানা পড়েছো?

—কেন! কি আছে তাতে?

—থাকবে আর কি! আমার সম্বন্ধে পাতা তিনেক কেচ্ছা লিখেছে ফুচেরি।

কাউণ্ট বললেন—কৈ, দেখি?

নানা পত্রিকাখানা টেবিলের উপর থেকে নিয়ে কাউণ্টের হাতে দিতেই, তিনি থিয়েটার-সমালোচনার পৃষ্ঠাটা পড়তে আরম্ভ করলেন।

প্রবন্ধের ভিতরে নানার নামোল্লেখ কোথাও নেই, কিন্তু ওটা যে নানাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা, এটা বুঝতে দেরি হয় না।

যা লেখা হয়েছিল, তার সারমর্ম হচ্ছে এই :

"যে গণিকাটির কথা লেখা হচ্ছে, লোকে বলে, এ-ও নাকি একজন অভিনেত্রী। এ যদি অভিনেত্রী হয়, তাহলে আরশোলাও পাখী! প্যারীর কোন পূতিগন্ধময় নর্দমায় জন্ম হলেও এই গণিকা আজ সমাজের গণ্যমান্য লোকদের, এমন কি মাননীয় রাজপুরুষদের পর্যন্ত নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। দেহের ফাঁদ পেতে এ শিকার ধরে বেড়াচ্ছে। দুষ্ট ক্ষতের মত এ যার গায়ে একবার বসছে, তারই সর্বাঙ্গ বিষদুষ্ট করে ছাড়ছে।"

প্রবন্ধটা পড়ে কাউণ্টের মনে হ'লো যে, তাঁকেই কটাক্ষ করে লেখা হয়েছে এটা। কাউণ্ট চুপ করে বসে কত কি ভাবতে লাগলেন : "সত্যিই তো! কত নীচে নেমে গেছি আমি!"

লেখাটি পড়ে কাউণ্টের যেন কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এলো। নানার দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হতে লাগলো—"এই সর্বনাশী নারীই আমাকে ধাপে ধাপে নরকের পথে টেনে নিয়ে চলেছে আজ!"

কাউণ্ট অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর মনের মধ্যে তখন দু'রকম ভাবের দ্বন্দ্ব চলতে লাগলো—প্রবৃত্তির তাড়না, আর বিবেকের দংশন। শেষ পর্যন্ত প্রবৃত্তিরই জয় হলো। বিবেকের হলো পরাজয়।

তিনি একরকম ছুটে গিয়ে নানাকে সবলে জড়িয়ে ধরে বুকের ভিতরে টেনে নিয়ে পিষে ফেলতে লাগলেন।

কাউণ্টের প্রেমের এই পাশবিক অভিব্যক্তিতে নানা একেবারে ক্ষেপে গেল। সে সজোরে ধাক্কা দিয়ে কাউণ্টকে দূরে ঠেলে দিয়ে বললো—চলে যাও! দূর হও তুমি এখান থেকে! বর্বর! পশু কোথাকার!

নানার ভর্ৎসনায় কাউণ্ট মুখ নীচু করে বসে রইলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, কাজটা অমানুষিকই হয়ে গেছে তাঁর।

নানা ভাবলো, অপমানিত হয়ে কাউণ্ট বোধ হয় এবার উঠবে।

কিন্তু কোথায়?

উঠবার কোন লক্ষণই যে নেই!

ওদিকে নানার শোবার ঘরে তখন অন্য একজন লোক বসে ছিল। লোকটার সঙ্গে আগে থেকেই ব্যবস্থা করা ছিল নানার, কিন্তু কাউণ্টকে বিদেয় করতে না পারলে যে সবই গোলমাল হয়ে যাবে!

নানা তখন মোক্ষম দাওয়াই দেবে ঠিক করে বললো—আচ্ছা কাউণ্ট! তোমার স্ত্রী তোমাকে ভালবাসে?

নানা হঠাৎ পারিবারিক প্রশ্ন তুলতে কাউণ্ট বিরক্ত হয়ে বললেন—তোমাকে না বলেছি যে, কাউণ্টেসের সম্বন্ধে কোন কথা তুমি বলবে না!

—কেন বলবো না? বললে কি তোমার বউয়ের সতীত্ব ক্ষয়ে যাবে নাকি? সতী যে কে কত বড়, তা সবারই জানা আছে। তবে কেউ ডুবে ডুবে জল খায়, আর আমরা না হয় সদরে কারবার করি, এইটুকুই যা তফাৎ।

কাউণ্টের আর সহ্য হলো না, তিনি হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে নানার গলা টিপে ধরে বললেন—কি! বাজারের মাগী হয়ে তোর মুখে এত বড় কথা! কাউণ্টেসের চরিত্র সম্বন্ধে কথা বলতে সাহস পাস তুই!

এই বলে ধাক্কা দিয়ে মেঝের উপরে ফেলে দিলেন তিনি নানাকে। নানাও রাগে একেবারে সাপের মত ফোঁস করে উঠে বললো—তবে রে ড্যাকরা মিন্‌সে! তুই আমার গায়ে হাত দিতে সাহস পাস! তোর বউ যে আজ ফুচেরির ঘরে ফুর্তি করছে, সে খবর রাখিস তুই? হারামজাদা লম্পট কোথাকার! বেরো তুই এখ্‌খুনি আমার বাড়ী থেকে!

নানা যে এভাবে অপমান করবে বা করতে পারে, কাউণ্ট মাফাত্‌ হয়তো কল্পনাও করেন নি সে কথা। তিনি একেবারে থ' হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন তিনি। তারপর হঠাৎ পাগলের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কোন কথা না বলে।

নানা এতক্ষণ ওঁর ভাবগতিক লক্ষ্য করছিল। তাই কাউণ্ট চলে যেতেই সে একেবারে খিল খিল করে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে সে

তার ঝিকে ডেকে বললো—জো! জো! কোথায় গেলি? শীগ্গির শুনে যা!

জো এসে বললো—আমাকে ডাকছো?

—হ্যাঁ তোকেই ডাকছি। দ্যাখ্ তো গ্যাছে নাকি আপদটা!

—কে? কাউন্ট?

—হ্যাঁ

জো সদর দরজা পর্যন্ত গিয়ে দেখে এসে বললো—হ্যাঁ গেছে।

নানা বললো—সে এসেছে?

—এসেছে বৈ কি!

—কোথায় বসিয়েছিস?

—চুলোর দোরে।

—বেশ করেছিস। এইবার তা হলে পাঠিয়ে দিগে, যা।

কাউন্ট যখন রাস্তায় এসে নামলো তখন বেশ বৃষ্টি পড়ছিল। জামা-কাপড় ভিজে গেল তাঁর। কিন্তু তাঁর তখন সেদিকে খেয়ালই নেই। মাতালের মত টলতে টলতে ফুচেরির বাড়ীর দিকে চলতে লাগলেন তিনি।

ফুচেরির বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই তিনি লক্ষ্য করলেন যে, দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে। তিনি তখন ঠায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন, জানালায় কোন মেয়েছেলের চেহারা দেখতে পান কিনা! শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলেন তিনি।

একটু পরে ফুচেরিকে দেখতে পেলেন তিনি। মুহূর্তের জন্য হলেও তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তার হাতে একটা জলের গ্লাস। ফুচেরি সরে যেতেই একজন মেয়েছেলের মুখও দেখতে পেলেন তিনি। মাথায় চুলের খোঁপাটা খুলে পড়েছে!—কী সর্বনাশ! এ যে তাঁরই স্ত্রী কাউন্টেস স্যাবাইন!

কাউণ্টেসকে ঐ সময়, ঐ অবস্থায়, ওখানে দেখে মাথার মধ্যে আগুন জলে উঠলো তাঁর। তাঁর একবার মনে হলো যে, তখনই তিনি ছুটে যান ওদের সামনে, কিন্তু পরক্ষণেই পারিবারিক কেলেঙ্কারির কথা মনে করে মনের ইচ্ছা দমন করলেন তিনি।

তাঁর পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছিল। পাগলের মত টলতে টলতে ওখান থেকে চলে গেলেন তিনি। কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন, কার কাছে যাচ্ছেন,—কিছুই খেয়াল নেই তাঁর।

সারাটা রাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে লাগলেন তিনি। পূবের দিক ফর্সা হয়ে এলো, কিন্তু কাউণ্ট তখনও হাঁটছেন। তাঁর পোশাক দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ছে। চুলগুলো রুক্ষ এবং এলোমেলো হয়ে গেছে। মাথায় টুপি নেই। চোখ দুটো জবাফুলের মত রাঙা। জুতা থেকে পাত্‌লুনের হাঁটু পর্যন্ত কাদা-মাখা। কে বলবে যে, ইনি একজন মহাসম্মানিত কাউণ্ট!

হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন যে, নানার বাড়ীর ফটকের সামনে এসে গেছেন তিনি। কি মনে করে সদর দরজায় কড়া নাড়তে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে জো এসে দরজা খুলে দিতেই কাউণ্টের অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেল সে।

কাউণ্টর অবস্থা দেখে দয়া হলো জো'র। সে বললো—এ কি! আপনার একি অবস্থা!

কাউণ্ট বললেন—নানা ঘুম থেকে উঠেছে?

জো বললে—না, এখনও ওঠেন নি। সারারাত মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়ে ভোরের দিকে ঘুমিয়েছেন। আপনি বরং একটু বসুন, আমি দেখছি দিদিমণি জেগেছেন কিনা।

নানা কিন্তু জেগেই ছিল।

কাউণ্টের কথার আওয়াজ পেয়ে নানা যেন ক্ষেপে গেল। নিজের মনেই সে বললো—কি আশ্চর্য! লোকটার দেখছি লজ্জা-সরম কিছুই নেই!

রাত্রে অতো অপমান করে বিদেয় করলাম, আবার ভোর না হতেই এসে হাজির!

দরজা খুলে নানা বাইরে এসে বললো—কি ব্যাপার! ভোর না হতেই এসে জুটলে? তুমি···

হঠাৎ কাউণ্টের সাজ-পোশাক আর চেহারার দিকে লক্ষ্য হতেই নানা অবাক হয়ে গেল। হয়তো বা দয়াও হলো কিছুটা!

সে বললো—একি! একি চেহারা হয়েছে তোমার!

কাউণ্ট বললেন—তুমি ঠিক কথাই বলেছিলে, নানা। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি তাকে—

নানা বললো—রাত্রিতে তুমি বাড়ী যাওনি নাকি?

কাউণ্ট বললেন—না।

—তবে কি সারারাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছো?

—জানি না। বোধ হয় তা-ই হবে।

—তুমি কি পাগল হলে নাকি? যাও, বাড়ী যাও। আর পাগলামি কোরো না। লোকে দেখলে কি বলবে বলতো?

—বাড়ীতে আর আমি ফিরে যাব না, নানা।

—তবে কি করবে?

—আমি তোমার এখানেই থাকবো।

নানা হঠাৎ ক্ষেপে গেল কাউণ্টের এই কথায়। সে বললো—আমার এখানে থাকবে, মানে? আমি কি তোমার ঘরের বউ নাকি? ও সব ন্যাকামি রেখে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

এই সময় আবার মঁসিয়ে ষ্টিনারকে একটি ফুলের তোড়া হাতে ওখানে আসতে দেখে নানা আর ধৈর্য রাখতে পারলো না। সে বললো—এই যে। বুড়ো সুদখোরটাও এসে জুটেছে দেখছি! তোমরা কি দু'জনে যুক্তি করে এসেছো নাকি?

ষ্টিনার কি যেন একটা বলতে যেতেই নানা তার কথায় বাধা দিয়ে বললো—আর ভালমানুষি করে কাজ নেই। বেরোও বলছি। বেরোও এখ্খুনি আমার বাড়ী থেকে। পাজী, ছোটলোক, ইতর, ছুঁচোর দল।

ওরা তখনও নড়ে না দেখে নানা বললো—তবু যাবে না? তা হ'লে দেখতে চাও, কেন তোমাদের তাড়াতে চাই আমি? এই ছাখো!

এই বলে সজোরে শোবার ঘরের দরজার পাল্লাটা খুলে দিতেই ওরা দেখলো যে, নানার খাটের উপরে বসে আছে ফণ্টান! ওদের থিয়েটারেরই একজন নট।

ফণ্টান মুখভঙ্গী করে উঠলো ওদের দেখে।

এই অপমান আর সহ্য করতে পারলেন না কাউণ্ট। রাগে, দুঃখে, অপমানে, ঈর্ষায় একেবারে পাগলের মত টলতে টলতে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন তিনি। ষ্টিনারেরও এ অপমান হজম করা কঠিন হলো, তাই সেও কাউণ্টের পেছনে পেছনে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ওরা চলে যেতেই নানা চীৎকার করে বললো—দোরটা বন্ধ করে দিয়ে আয় জো!

সেই ভিজে কাদামাখা পোশাকেই কাউণ্ট টলতে টলতে বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন। বাড়ীতে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতেই সামনে দেখতে পেলেন কাউণ্টেসকে। কাউণ্টেসের চুলগুলো তখনও উস্কোখুস্কো। পোশাক অবিন্যস্ত।

নয়

রাগের মাথায় নানা কাউন্টকে আর ষ্টিনারকে বিদেয় করলো বটে, কিন্তু পরে যখন মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হলো তখন সে ভেবে দেখলো যে, কাজটা খারাপই করে ফেলেছে সে।

দু'-দু'টো পয়সাওলা লোককে একসঙ্গে বিদেয় করা যে মোটেই যুক্তিসঙ্গত হয় নাই, একথা মর্মে মর্মে অনুভব করতে লাগলো সে।

কিন্তু তখন আর কোনই উপায় নেই।

নানা বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছে দেখে ফণ্টান বললো—কি এত ভাবছো বলো তো?

—কি আর ভাববো! ভাবছি আমার অদৃষ্টের কথা। দেনায় মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে আছে আমার। কি দিয়ে যে কি হবে, কিছুই বুঝতে পারছি না।

—তা, ভেবে আর কি করবে, বলো? তার চেয়ে চেষ্টা করো দেনা শোধ করতে।

—তুমি তো সোজা বলে দিলে দেনা শোধ করতে। কিন্তু কত দেনা সে খবর রাখো তুমি?

—কত?

—বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক।

—বলো কি! তুমি কি টাকা চিবিয়ে খাও নাকি?

—একরকম তাই।

এই বলে আবার চুপ করে গেল নানা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মনে মনে কিছু একটা ভেবে নিয়ে নানা হঠাৎ বললো—ঠিক হয়েছে!

—কি ঠিক হয়েছে ?

—আমি এখান থেকে চলে যাবো। হ্যাঁ, আজই চলে যাবো আমি।

—কোথায় ?

—যে কোন একটা পাড়াগাঁয়ে। শহরের এই ঘৃণ্য জীবন আর আমি সহ্য করতে পারছি না। আমি শান্তিতে থাকতে চাই। এই বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নানা আবার বললো—তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?

—তা যদি বলো তো নিশ্চয়ই যাবো।

—তা হলে এক কাজ করো। আমার জিনিসপত্র যা কিছু আছে, সব বিক্রি করে দিয়ে, চলো আজই দু'জনে সরে পড়ি এখান থেকে। জিনিসগুলো বেচে দিলে অন্ততঃ দশ-পনর হাজার ফ্রাঙ্ক তো পাবোই, কি বলো ?

—তা হয়তো হবে।

ঐ দিন বিকেলেই নানা আর ফন্টান প্যারী থেকে উধাও হ'লো। জিনিসপত্র বিক্রি করা সম্ভব হলো না। কারণ, তা হ'লে পাওনাদারের দল ছেঁকে ধরতো এসে।

নানা তাই গোপনে গোপনে তার গয়নাগুলো বিক্রি করে মাত্র দশ হাজার ফ্রাঙ্ক সম্বল করেই ফন্টানের সঙ্গে চলে গেল।

ফন্টানও কিছু পয়সাকড়ি যোগাড় করেছিল এতদিন থিয়েটারে চাকরি করে। কিন্তু তার সারাজীবনের সঞ্চয়ও সাত হাজার ফ্রাঙ্কের বেশি হলো না।

তা না হোক !

নানা ভাবলো যে, হিসেব করে চললে ঐ সতেরো হাজার ফ্রাঙ্কেই দু'জনের বেশ চলে যাবে। কি হবে তার রাণীর চালে থেকে ?

শহরতলীতে একখানা চারতলা বাড়ীর উপরের তলায় একখানা মাত্র ঘর অল্প টাকায় ভাড়া নিয়ে বাস করতে লাগলো দু'জনে।

নতুন সংসারে এসে নানা ভুলে গেল তার আগের জীবন। সে নিজের হাতে রান্না করে, সংসারের কাজ করে, ফন্টানকে আদর করে খাওয়ায় আর নিজে খায়।

নতুন প্রেমের নতুন দিনগুলো খুবই আনন্দে কাটতে লাগলো নানার।

আনন্দের আতিশয্যে একদিন থিয়েটারের লোকদেরও নেমন্তন্ন করে খাওয়ালো সে। সবাই মনে মনে না হলেও মুখে এমন ভাব দেখালো যে, নানার নতুন সংসার দেখে তারা খুবই খুশী হয়েছে।

ঐ বাড়ীতে যাবার বারো দিন পরে নানার মাসী মাদাম লিরাত এসে হাজির হ'লো নানার ছেলে লুইকে সঙ্গে নিয়ে। ফন্টান তখন বাড়ীতে ছিল না। মাদাম লিরাত ফন্টান সম্বন্ধে একটু বিরূপ মন্তব্য করতেই নানা বলে উঠলো—ওরকম কথা বলো না, মাসী। ও খুব ভাল লোক। তা ছাড়া আমি ওকে ভীষণরকম ভালবেসে ফেলেছি।

বোন-ঝির কথায় মাদাম্ বললেন—বেশ বেশ! তুমি সুখী হলেই ভালো। কিন্তু জো'র মুখে শুনলাম যে, ও-বাড়ীতে পাওনাদাররা এসে নাকি যাচ্ছে-তাই করছে তাকে। জো অবশ্য বলেছে যে, তুমি বাইরে বেড়াতে গিয়েছো। কিন্তু এভাবে আর কতদিন ঠেকিয়ে রাখবে সে!

নানা কিন্তু রেগে উঠলো মাসীর এই কথায়। সে বললো—পাওনাদারদের কি আমি ফাঁকি দেব নাকি! হাতে টাকা হলেই আমি মিটিয়ে দিয়ে আসবো ওদের দেনা। আসলে ওরা কি চায়, জানো? ওরা চায় আমি আগের মত বেশ্যাবৃত্তি করি। কিন্তু আমি আর সে পথে যাচ্ছি না, মাসী। তা ছাড়া, ফন্টান আমাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে।

ওদের যখন এইসব কথাবার্তা হচ্ছিলো, লুই তখন একটা ঘর-ঝাঁট-দেওয়া ঝাঁটা নিয়ে সেটার উপরে ঘোড়ার মত চড়ে হেট্ হেট্ করে খেলা করছিল। এইসময় ফন্টান বাড়ীতে এসে লুইকে দেখে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে বললো—খোকা তোমার বাবাকে দেখেছো?

লুই মাথা নেড়ে জানালো সে দেখে নাই।

ফণ্টান বললো—আমিই তোমার বাবা, বুঝেছো? আমাকেই বাবা বলে ডাকবে তুমি।

লুই বললো—বাবা!

সে রাত্রে নানা মাসী আর লুইকে নিজের কাছে রেখে আদর করে খাইয়ে পরদিন বিদায় দিল। লুইকে বিদায় দেবার সময় তার মুখে চুমো খেয়ে নানা বললো—আজ যাও, খোকন। সময় পেলেই আমি তোমাকে দেখে আসবো!

কিন্তু শীগ্গিরই ভালবাসার নদীতে ভাটার টান এলো। নানার উপরে ফণ্টানের যে সাময়িক মোহ এসেছিল, সেটা কমে যেতে লাগলো। কামনায় অন্ধ পুরুষ ঈপ্সিত নারীকে পাবার পর যখন তার জৈবিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার অবাধ স্থযোগ লাভ করে, তখন সেই নারীর উপরে তার মোহটাও কমে আসে, তা সে যত স্থন্দরীই হোক না কেন। দূর থেকে অনেক নারীকেই স্বর্গের অপ্সরী মনে হয়, কিন্তু একত্র বসবাস স্থরু করলেই তার চরিত্রের খুঁত-গুলো প্রকটিত হয়ে পড়ে।

ফণ্টানও তাই ক্রমে নানার সঙ্গে ছাড়ো-ছাড়ো ব্যবহার স্থরু করলো। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, কোন কোন দিন একেবারেই বাড়ীতে আসতো না সে।

এই সময় একদিন নানাকে নিয়ে এক সস্তা থিয়েটারে গেল ফণ্টান। সে ওখানকার ছ'খানা পাশ যোগাড় করেছিল সেদিন।

অভিনয় দেখে বাড়ীতে ফিরবার পথে হোটেলেই খেয়ে নিল ওরা, কারণ অতো রাত্রে বাড়ীতে ফিরে রান্নাবাড়ার হাঙ্গামা করা সহজ নয়। বাড়ীতে এসে জামা-কাপড় না ছেড়েই থিয়েটার সম্বন্ধে আলোচনা করতে লেগে গেল ওরা।

একজন অভিনেত্রীকে ফণ্টান উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করলে নানা বলে উঠলো—ফুঃ! ও আবার অভিনেত্রী! শণের দড়ির মত একমুঠি চুল, আর

চোখ দুটো যেন সব সময় কুত্‌ কুত্‌ করছে। তা ছাড়া, দেহখানি যেন একফালি লম্বা তক্তা।

ফণ্টান ক্ষেপে গেল নানার কথায়।

হঠাৎ বলে বসলো সে—প্রত্যেক মেয়েমানুষই ভাবে যে, দুনিয়ায় সে-ই বুঝি সেরা সুন্দরী। জেনে রেখো, ও তোমার চেয়ে কোন অংশে কম সুন্দরী নয়।

—ইস্! মরে যাই রে! অতোই যদি ডাকের সুন্দরী, তা হলে ঐ বদ্দি থিয়েটারের সখীর দলে নামছে কেন?

—ত্যাখো নানা! বেশি ভ্যানর-ভ্যানর করো না বলে দিচ্ছি। অন্যায় কথা শুনলে ভয়ানক রেগে যাই আমি, তা জানো?

—ওরে আমার রাগের গোঁসাই রে! তুমি রাগলে তো আমার বয়েই গেল। আমি কি কারো খাই, না পরি যে, লোকের রাগের ধার ধারবো?

—তবে রে হারামজাদী মাগী, কারো ধার ধারিস নে তুই? দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি মজা!

এই বলে ফণ্টান হঠাৎ উঠে চটাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল নানার গালে।

চড় খেয়ে নানা চীৎকার করে বলে উঠলো—আমাকে মারলে তুমি?

—মারলামই তো, আরো মারবো। হারামজাদী মাগী, আমাকে কি তোর ঐ ভেড়ুয়া কাউণ্ট পেয়েছিস্ নাকি?

—কি বললে? আমার টাকায় খাচ্ছো-দাচ্ছো, আবার আমার উপরেই রোয়াব?

—কি! তোর টাকায় খাই আমি?

—খাস্-ই তো?

—তবে রে পাজী মাগী, দাঁড়া তোকে শিক্ষা দিচ্ছি আমি।

এই বলে নানার গলা টিপে ধরে তাকে মেঝের উপরে ফেলে দিয়ে মাথাটা মেঝের উপরে বার দুই ঠুকে দিল সে।

তারপর যেন কিছুই হয়নি—এইভাবে ধীরে সুস্থে উঠে জামা-কাপড় ছেড়ে, হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো ফন্টান।

ফন্টানের হাতে মার খাওয়া ঐ দিনই বউনি হলো নানার।

এরপর থেকে প্রত্যহই চলতে লাগলো প্রহার।

যে নানা কিছুদিন আগেও প্যারীর ধনাঢ্য সম্প্রদায়কে নাচিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, আজ সে নিজ হাতে বাজার করে!

একটা ভাল গাউনও তার জোটে না!

নানা যে পল্লীতে ঘরভাড়া নিয়েছিল, সে পল্লীটা ঠিক ভদ্রপল্লী ছিল না। ওখানকার মেয়েদের মধ্যে অনেকেই সন্ধ্যার সময় পুরুষ শিকার করে ঘরে ফিরতো, আর সারারাত সেই সব অপরিচিত পুরুষদের কাছে দেহ বিকিয়ে দিয়ে যা রোজগার করতো, সেই পয়সা নিয়ে পরদিন সকালে যেতো বাজার করতে। সারারাত্রির দৈহিক অত্যাচারের চিহ্ন ফুটে উঠতো তাদের চোখে-মুখে। রাতের সেইসব অপ্সরীরা সকাল হলেই তাদের পুরুষ-ধরা পোশাক খুলে রেখে সস্তা আধ-ময়লা পোশাক পরে বের হ'তো বাজার করতে। কারো মুখে তখনও লেগে থাকতো রাতের প্রসাধনের দাগ, আবার কারো বা থাকতো না। ওদের মধ্যে বেশির ভাগ মেয়েছেলেই বিগতযৌবনা—যৌনব্যাধিগ্রস্তা। অবশ্য অল্পবয়সের মেয়েও যে ছিল না ওদের মধ্যে তা নয়। সারারাতের জাগরণক্লিষ্ট দেহটিকে কোনরকমে টেনে নিয়ে যেতো ওরা বাজারের দিকে, কারণ, ঝি-চাকর রাখার মত সঙ্গতি ছিল না কারোই।

সাটিন নামে একটি মেয়েও উঠে এসেছিল এই পাড়ায়। সাটিনের সঙ্গে নানার আগে থেকেই পরিচয় ছিল। নানা যখন থিয়েটারে নামে নি, সেই সময়কার পরিচয়। একদিন সকালে বাজার করতে গিয়ে সাটিনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল নানার। নানাকে এই পাড়ায় দেখে এবং বিশেষ করে তাকে নিজের হাতে বাজার করতে দেখে সাটিন আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি নানার কাছে গিয়ে বললো—একি! নানা, তুমি এখানে?

অনেকদিন পরে সাটিনকে দেখে নানাও খুশী হয়ে বললো—কি আশ্চর্য! সাটিন, তুমি?

তারপর অনেক কথা হলো দুই বন্ধুতে। সাটিন নানাকে সঙ্গে করে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে অনেক সুখ-দুঃখের কথা বললো। নানাও বললো তার প্রেমের কাহিনী। সে জানালো যে, আর্থিক কষ্ট একটু হলেও ফন্টানকে নিয়ে খুব সুখেই আছে সে।

এই সময় একদিন বাজারে মাংস কিনতে গিয়ে হঠাৎ ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল নানার।

নানাকে নিজের হাতে বাজারের থলে বইতে দেখে থমকে দাঁড়ালো ফ্রান্সিস।

সে আর থাকতে না পেরে নানার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো—একি অবস্থা হয়েছে আপনার! নিজের হাতে বাজার পর্যন্ত করতে হচ্ছে আপনাকে! এ যে কেউ ভাবতেও পারে না!

নানা বললো—তাতে কি হয়েছে? বেশ আছি আমি। আমার আর ভালো লাগে না আগের মত হাজার লোকের মন যুগিয়ে চলতে।

ফ্রান্সিস বললো—কিন্তু তাই বলে নিজের হাতে বাজার করতে হবে? একটা চাকরও তো রাখতে পারেন?

—না ফ্রান্সিস, এই বেশ আছি আমি। যাক, তারপর ওদিকের সব খবর কি? ষ্টিনার কি করছে এখন?

—ষ্টিনার? তার অবস্থা এখন খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে। দেনার দায়ে দেউলে হয়েছে সে।

—তাই নাকি? আর ড্যাগনেট? ড্যাগনেট কেমন আছে?

—তার দিন তো বেশ স্ফূর্তিতেই চলছে আজকাল। তোমার সেই কাউণ্টের মেয়েটাকে গেঁথেছে ও। মনে হচ্ছে শীগ্‌গিরই ওদের বিয়ে হবে।

—ভালো, ভালো। আর সবাই?

ফ্রান্সিস বুঝলো যে কাউণ্টের কথা জিজ্ঞাসা করতে চাইছে নানা।

সে তখন বললো—কাউণ্ট এখন রোজির সঙ্গে জুটেছে, সে খবর জানেন?

—তাই নাকি! রোজি তা হলে এখন আমার এঁটো পাত চাট্‌ছে, কি বলো?

—তা যা বলেছেন। কিন্তু আপনি চলুন না আবার? আপনি ফিরে গেলে সবারই থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যাবে, দেখে নেবেন।

—না ফ্রান্সিস, আমি আর যাবো না! আচ্ছা, আজ আসি।

নানা চলে গেলে ফ্রান্সিস মনে মনে বললো—মেয়েছেলেটার দেখছি একেবারেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

এদিকে নানার উপরে ফণ্টানের নেকনজরও ঢিলে হয়ে আসছিল। সেদিনকার সেই প্রহারের পর থেকে ফণ্টান প্রায় রোজই নানাকে ধরে পিটতে সুরু করেছিল।

একদিন কি একটা কথার পিঠে নানা বললো—তুমি তো দেখছি প্রায়ই বাইরে বাইরে রাত কাটাচ্ছো আজকাল!

ফণ্টান তেড়ে উঠলো এই কথায়।

সে বললো—বেশ করছি! আমি কি কারো হুকুমের চাকর নাকি?

নানা বললো—তুমি সব সময় অত তেজ দেখিয়ো না আমাকে, বুঝলে?

—কি বল্‌লি? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? তোর মত কত মেয়েমানুষ আমার পায়ে ধরে সাধছে, তা জানিস্?

—তা আর জানিনে? সেই বেড়াল-চোখী উর্বশীটি তো?

—সে বেড়াল-চোখীই হোক, আর ইঁদুর-চোখীই হোক, তোর চেয়ে ঢের ভাল।

নানাও ক্ষেপে গেল তার সামনে অন্য মেয়ের প্রশংসা শুনে।

সে বললো—বেশ তো! গেলেই তো হয় তার কাছে।

এই ভাবে কথা কাটাকাটি হ'তে হ'তে অবশেষে রোজকার মত সেদিনও মার খেতে হলো নানাকে।

এর কয়েকদিন পরে ফন্টান একদিন নানাকে বললো—বাক্সের চাবিটা দাও তো?

নানা চাবি বের করে ফন্টানকে দিতেই সে বাক্স খুলে টাকাকড়ি সব বের করে নিয়ে গুণতে আরম্ভ করলো।

নানা জিজ্ঞাসা করলে—কি ব্যাপার?

—দেখছি, কত কি আছে না আছে!

গুণে দেখলো যে, তখন মাত্র সাত হাজার ফ্রাঙ্ক অবশিষ্ট আছে। ফন্টান টাকাগুলোকে নিয়ে পকেটে পূরে বললো—এ টাকা আমার। তোমার দশ হাজার ফ্রাঙ্ক তুমি খরচ করে ফেলেছ। আমার এ টাকা আমি দেব না।

সেই দিন থেকে নিদারুণ অর্থকষ্টে দিন চলতে লাগলো নানার। শেষে অবস্থা এমনই হয়ে দাঁড়ালো যে, এক প্যাকেট সিগারেট কিনবার পয়সাও তার থাকতো না। ফন্টান রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনটি ফ্রাঙ্ক ফেলে দিতো বাজার করতে, আর ঐ টাকা নিয়ে যেতো নানা রোজকার বাজার করে আনতে।

এই সময় একদিন বাজারে যাবার পথে লা-বোর্দেতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল নানার।

অনেকদিন পরে দেখা হওয়ায় অনেক কথাই হলো তাদের মধ্যে। লা-বোর্দেত্ বহু চেষ্টা করলো নানাকে আবার স্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, কিন্তু নানা কিছুতেই রাজী হলো না।

সে বললো যে, বেশ্যাবৃত্তি সে আর করবে না।

কথায় কথায় শহরের সব খবর কিন্তু জেনে নিতে ভুললো না সে। নানা বললো—কাউণ্ট নাকি রোজির সঙ্গে জুটেছে ?

—কে বললো তোমাকে ?

—এ সব খবর কি গোপন থাকে নাকি ?

—সত্যি নানা, তুমি নেই বলেই 'ওদের যত জারি-জুরি বেড়েছে। তুমি গেলে সবাই আবার যে-কে-সেই হয়ে যাবে।

নানা বললো—না ভাই, আমি আর শহরে যাবো না।

লা-বোর্দেত্ বললো—তা তো হলো, কিন্তু ফ্চেরি যে ওদিকে খুব জমিয়ে নিয়েছে ভ্যারাইটিতে, সে খবর রাখো ?

—না তো! কি করছে সে ?

—কি করছে মানে? তার লেখা একখানা নাটক অভিনীত হতে যাচ্ছে শীগ্গিরই। এখন তার কী খাতির থিয়েটারে!

লা-বোর্দেতের কাছে এই সব খবর পেয়ে নানা বাড়ীতে এসে ফণ্টানকে বললো—ভ্যারাইটিতে নতুন বইয়ের মহলা হচ্ছে, আমাকে সে কথা বলোনি তো ?

ফণ্টান বললো—সে খবরে তোমার কি লাভ ? তুমি তো আর থিয়েটারে ফিরে যাচ্ছো না ? আর তা ছাড়া, তোমার প্লে করবার মত ঢলানির পার্টও নেই ও বইতে।

নানা রাগ করে বললো—আমি বুঝি ঢলানির পার্ট ছাড়া অন্য পার্ট করতে পারি না ?

—সত্যি কথা বলতে কি, তুমি পারো না কোন পার্ট-ই। লোকে যে তোমাকে বাহবা দিতো, সে তোমার অভিনয় দেখে নয়, তোমার দেহের যৌবন দেখে।

নানা দেখলো যে, এরপর কোন কথা বলতে গেলে ঝগড়া হওয়া অনিবার্য, তাই সে কোন কথা না বলে রান্নাবান্নার যোগাড়ে লেগে গেল।

আরও কয়েকদিন পরের কথা।

নানা সেদিন কি একটা কাজে বাইরে গিয়েছিল। বাড়ীতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল তার।

কিন্তু বাড়ীতে এসে যে দৃশ্য সে দেখলো, তাতে তার মাথার ভিতরে আগুন জলে উঠলো।

নানা ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেলো যে, থিয়েটারের সেই অভিনেত্রীটা তারই শয্যায় শায়িতা রয়েছে ফণ্টানের সঙ্গে।

এ দৃশ্য সহ্য হ'লো না নানার।

মেয়েটিকে লক্ষ্য করে গালাগালি দিয়ে বলে উঠলো সে—তুই কে রে গতরখাকী? আর জায়গা পেলিনে রে ঘাটের মরা? এসে একেবারে আমার খাটের উপরে ঠাকরুণ সেজে বসেছিস্?

নানার মুখের কথা শেষ না হতেই ফণ্টান হঠাৎ খাট থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে সজোরে গলা টিপে ধরলো নানার।

এইভাবে হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে নানা একেবারে হকচকিয়ে গেল। সে কিছু করবার আগেই ফণ্টান তাকে ঘরের বাইরে ঠেলে দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল বারান্দার উপরে।

আঘাতের যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করে উঠলো নানা, কিন্তু ফণ্টান সেদিকে ভ্রূক্ষেপও না করে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

ফণ্টানের হাতে এইভাবে মার খেয়ে নানা দুঃখে, লজ্জায় আর অপমানে পাগলের মত হয়ে রাস্তায় নেমে এলো। নিদারুণ শীতে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে সে পথ দিয়ে চলতে লাগলো।

তার হাতে তখন এমন একটা পয়সা ছিল না যে, গাড়ী ভাড়া করে।

অতো রাত্রে কোথায় যাবে, কোথায় গেলে রাতটুকুর মত আশ্রয় পাবে—এই কথা চিন্তা করে পাগল হয়ে উঠলো নানা। হঠাৎ তার মনে পড়লো সাটিনের কথা। সাটিনের বাড়ীটা সে দেখে এসেছিল কিছুদিন আগে। নানা তখন একরকম ছুটতে ছুটতে সাটিনের বাড়ীতে গিয়ে তার ঘরের দরজায় করাঘাত করতেই সাটিন বেরিয়ে এসে নানাকে ঐ অবস্থায় দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—একি! তুমি হঠাৎ এত রাত্রে?

নানা বললো—ঘরে চলো, বলছি।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে নানা সাটিনকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললো। পরে বললো—ও আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আজকের রাত্রের মত তোমার ঘরে আমাকে থাকতে দাও, সাটিন।

দশ

বুলভার্দ পল্লীর সেই বাড়ীখানা তখনও নানার ছিল। নানার পরিচারিকা জো সেই বাড়ীতে নানার জিনিসপত্র আগলে বাস করছিল। চরম দুঃসময়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে সেই বাড়ীতেই আশ্রয় নিল সে। এই বাড়ীতে আসবার পর থেকেই ফণ্টানের সেই কথাটা নানার মনে সব সময় আঘাত দিতো— "সত্যিকথা কলতে কি, তুমি পারো না কোন পার্টই। লোকে যে তোমাকে বাহবা দিত, সে তোমার অভিনয় দেখে নয়, তোমার দেহের যৌবন দেখে।"

নানা মনে মনে প্রতজ্ঞা করলো যে, অভিনয় করে সে ফণ্টানকে দেখিয়ে দেবে, ভালো অভিনয় সে করতে পারে।

এদিকে নানা আবার ফিরে এসেছে, এই খবর পেয়েই ছুটে আসতে লাগলো তার পুরোনো বন্ধু-বান্ধবীর দল। ভ্যারাইটির ম্যানেজার বোর্দেনেভও দেখা করে গেল একদিন। তার কাছ থেকে নানা খবর পেলো যে, ভ্যারাইটিতে তখন ফুচেরির লেখা 'লিট্‌ল্ ডাচেস্' নাটকের অভিনয়ের জন্য মহলা চলছে। তা ছাড়া, কাউণ্ট মাফাতের কাছে কিছু টাকা ধার করেছে সে থিয়েটারের জন্য!

নানার ইচ্ছে হলো ঐ নাটকে একটা ভাল পার্ট নিতে। প্রকারান্তরে ম্যানেজারকে বললোও সে, কিন্তু ম্যানেজার যেন গা-ই করলো না তার কথায়। কথায় কথায় নানা এখবরও জেনে নিল যে, রোজিই ঐ নাটকের নায়িকার ভূমিকায় নামবে।

রোজির উপরে ঈর্ষা হলো নানার। রোজি শুধু নায়িকার পার্টই করছে না, কাউণ্ট মাফাত্‌কেও সে গেঁথে ফেলেছে। কাউণ্ট লোকটার বয়স হলে কি হয়, টাকা-পয়সা বেশ মোটা হাতেই আদায় করা যেতো তার কাছ থেকে। এই সব কথা চিন্তা করে নানা মনে মনে ঠিক করলো যে, কাউণ্টকে আবার সে হাত করবে। কাউণ্টকে দিয়েই কাজ হাঁসিল করবে সে।

লা-বোর্দেত্‌কে সঙ্গে নিয়ে তাই সেদিন মহলা দেখতে ভ্যারাইটিতে গেল নানা। থিয়েটারে গিয়ে কারো সঙ্গে দেখা না করে চুপি চুপি একটা বক্সে গিয়ে বসে মহলা দেখতে আরম্ভ করলো সে। লা-বোর্দেত্‌কে বলে দিল যে, কাউন্ট মাফাত্ এলেই যেন তাঁকে সে ডেকে আনে।

ওখানে তখন 'লিটল ডাচেস'-এর স্টেজ-রিহার্স্যাল হচ্ছিলো। দৃশ্য-পরিবর্তন বা কনসার্ট ইত্যাদি না হলেও নায়ক-নায়িকারা সবাই স্টেজে এসে যে যার পার্ট অভিনয় করছিল। ম্যানেজার বোর্দেনেভ আর নাট্যকার ফুচেরি পাশাপাশি দু'খানা চেয়ারে বসে ছিল স্টেজের উপরে।

নানা শুনেছিল যে, কাউন্ট মাফাত্‌ও রোজই মহলা দেখতে আসেন।

মহলা চলছে। ফণ্টানের সঙ্গে নাট্যকার ফুচেরির খানিকটা কথা-কাটাকাটি হয়ে গেল।

ফণ্টানের অভিনয় শুনে ফুচেরি বলে উঠলো—নানা, ওরকম হবে না ওখানটায়।

ফণ্টান বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো—আরে মশাই, আপনাকে আর অভিনয় শেখাতে হবে না। কোন্ চরিত্র স্টেজে কিভাবে চলাফেরা করবে, বা কথা বলবে, তা আপনার চাইতে আমি বেশি জানি।

ফুচেরি বললো—কি বললেন মশাই ? আপনি একেবারে সবজান্তা হয়ে বসে আছেন ! কিন্তু আমার নাটকে অভিনয় করতে হলে আমার কথামতই চলতে হবে মশাইকে, বুঝলেন ?

এর উত্তরে ফণ্টান কি একটা কথা বলতেই ফুচেরি চীৎকার করে উঠলো—থামুন আপনি !

ম্যানেজার দেখলো যে, এই বুঝি ঝগড়া বেধে ওঠে অভিনেতা আর নাট্যকারের মধ্যে। সে তখন বুদ্ধি করে অন্য দৃশ্যের মহলা স্থরু করবার হুকুম দিয়ে ঝগড়াটাকে আর বাড়তে দিল না।

প্রম্‌টার হাঁকলো—ডাচেস্ আর সেণ্ট ফারমিন। ডাচেস্ কোথায় ?

ডাচেস্‌-এর পার্ট করবে রোজি। কিন্তু সে তখন 'ফলিজ ড্রামাটিক থিয়েটার' থেকে মোটা টাকার 'অর্ডার' নিয়েছে, এই কথাটা নিয়ে আলোচনায় মশগুল অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে।

কে একজন তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বললো—ডাচেস্‌-এর ডাক পড়েছে যে!

"ওমা, তাই নাকি!" বলে রোজি উঠে স্টেজের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো।

প্রম্‌টার বলে যেতে লাগলো আর রোজি অঙ্গভঙ্গি সহকারে অভিনয় করে যেতে লাগলো 'লিট্‌ল্‌ ডাচেস্‌' চরিত্রের।

সেণ্ট ফারমিন্‌? সেণ্ট ফারমিনের প্রবেশ হবে এখানে।—বলে উঠলো প্রম্‌টার।

কিন্তু কেউ আসে না দেখে ম্যানেজার গরম হয়ে বললো—একি কাণ্ড! সেণ্ট ফারমিন কোথায়?

আসলে সেণ্ট ফারমিনের পার্ট দেওয়া হয়েছিল নটভাস্কর প্রুলিয়ারকে। ঐ বাজে পার্ট তার পছন্দ না হওয়াতেই সে দেরি করছিল আসতে।

ওদিকে নানা চুপ করে বক্সে বসে মহলা দেখছিল আর লক্ষ্য করছিল কাউণ্ট এলেন কিনা।

কিছুক্ষণ পরেই মঁসিয়ে মিগননের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কাউণ্ট মাফাত এসে গেলেন। নানা লা-বোর্দেত্‌কে বললো—সে এসেছে।

লা-বোর্দেত্‌ বললো—আমি এখনই যাচ্ছি।

নানা বললো—না, চলো আমরা এখান থেকে দোতলার সাজঘরে যাই। আমি ওখানে অপেক্ষা করবো। তুমি গিয়ে কাউণ্টকে ডেকে নিয়ে আসবে সেখানে।

নানাকে সাজঘরে পৌঁছে দিয়েই লা-বোর্দেত্‌ চলে গেল। নানা দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে একখানা চেয়ারে গিয়ে বসলো। অনেক কথাই তার মনে হ'তে লাগলো। সে ভাবলো—এক্ষুনি কাউণ্ট এসে পড়বে। তারপর? সেদিন তাকে যেভাবে অপমান করে বিদায় করেছিলাম, সেই কথা মনে করে

সে যদি না আসে? না এলে তো সব প্ল্যানই মাটি! কিন্তু সে কি পারবে না এসে? নিশ্চয়ই আসবে সে।

বাইরে থেকে দরজায় কে করাঘাত করলো। নানার বুকটা কেন যেন দুরু দুরু করে উঠলো একবার। সে বললো—ভিতরে আসুন!

কাউণ্ট মাফাত্ দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখেই নানা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে পাশের জানালাটা বন্ধ করে দিল।

কাউণ্ট নানার ঠিক সামনে এসে দাঁড়ালেন। নানার মুখের দিকে তাকালেন তিনি। নানাও তাকালো তাঁর দিকে। কারো মুখেই কোন কথা নেই।

দু'জনেই নির্বাক।

নানাই কথা বললো প্রথমে। হাসি-মুখে সে জিজ্ঞাসা করলো—কেমন আছো, কাউণ্ট?

কাউণ্ট কিন্তু নানাকে দেখে এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, ভাল করে গুছিয়ে কথা বলতেও পারছিলেন না তিনি। তিনি নানাকে প্রথমটায় 'ম্যাদাম্' বলেই অভিহিত করে ফেললেন আনন্দের আতিশয্যে।

নানা বললো—আমাকে তুমি ক্ষমা করো, কাউণ্ট। অনেকদিন পরে এসেছি। তোমার জন্য মনটা কেমন করে উঠলো, তাই না এসে থাকতে পারলাম না।

কাউণ্ট বললো—এসেছো যখন, তখন আর তোমাকে অন্য কোথাও যেতে দেব না। তুমি যদি চাও, তা হলে আমি শহরের সবচেয়ে অভিজাত পল্লীতে যে বাড়ীখানা তৈরি করেছি, সেখানাও তোমাকে দিতে পারি। তুমি হয়তো আজও জানো না, নানা, আমি তোমাকে কতখানি ভালবাসি। তোমাকে আমার যথাসর্বস্ব দান করতে পারি আমি। গাড়ী, ঘোড়া, গহনা, আসবাবপত্র—যা চাও। শুধু তুমি একটিবার বলো যে, তুমি আমার কাছে থাকবে, তুমি আমার হবে!

কাউণ্টের উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে নানা বললো—এসেই সুরু করলে তো! বসো দেখি একটু স্থির হয়ে।

কাউণ্ট বসলে নানা আবার বললো—টাকা দিয়ে কি ভালবাসা কেনা যায়, কাউণ্ট ? টাকা বা বাড়ীর লোভ তুমি আমাকে দেখিও না। তোমার সঙ্গে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।

—কেন, অসম্ভব কেন নানা ? আমি কি তোমাকে সুখে রাখতে পারবো না ? আমি কি তোমার জন্য…

—সে কথা হচ্ছে না। বললাম তো—টাকা দিয়ে মেয়েদের ভালবাসা পাওয়া যায় না। টাকার গর্ব দেখিয়ে তুমি যদি আমাকে হাত করতে চাও, তা হলে তুমি ভুল করবে। যা-ই হোক, ওকথা বাদ দাও।

—কেন বাদ দেবো, নানা ? আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। বলো, তুমি রাজী!

—কি পাগলামি আরম্ভ করলে, কাউণ্ট! এরকম করো তো আমি চলে যাচ্ছি।

এই কথা বলে নানা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতেই কাউণ্ট হঠাৎ তার পায়ের কাছে হাটু গেড়ে বসে তার উরু দু'টি জড়িয়ে ধরে বললেন—না। তোমাকে আমি যেতে দেবো না। কিছুতেই না।

নানার উরু দু'খানিকে তিনি সজোরে চাপতে লাগলেন নিজের বুকের সঙ্গে। নিজের মুখখানা নানার দুই উরুর মাঝখানে ঘষতে লাগলেন তিনি। বহুদিন পর নানার কোমল দেহ স্পর্শ করতে পেরে কাউণ্ট যেন দিশেহারা হয়ে গেলেন। উপরের পাতলা পোশাকের আস্তরণের নীচেই আছে নানার ভেলভেটের মত মসৃণ দেহবল্লরী।…

আরো জোরে—আরো জোরে কাউণ্ট নানাকে চাপতে লাগলেন। যেন নানার সঙ্গে তিনি এক হয়ে যেতে চান।

নানা বললো—কি হচ্ছে কাউণ্ট ? ছিঃ! ওঠো, আমি যা বলি শোনো!

কাউণ্ট কিন্তু না ছেড়ে দিয়েই বললেন—কি বলছো ?

—আগে উঠে বসো, তার পর বলছি।

শেষে মেষশাবকের মত নানার কথায় উঠে বসলেন তিনি। উঠে বসে বললেন—কি বলছো ?

নানা বললো—বলছি কি, তুমি সত্যিই আমাকে চাও ?

—সত্যিই চাই মানে? তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না কেন ?

—বেশ, তা হলে আমার জন্য একটা কাজ তোমাকে করতে হবে। 'লিট্‌ল্ ডাচেস্' নাটকে ডাচেস্ হেলেনার পার্টটি আমাকে পাইয়ে দিতে হবে।

কাউণ্ট বললেন—থিয়েটারের পার্ট আমি কি করে পাইয়ে দেবো, বলো তো ?

—তুলি ইচ্ছা করলেই পারবে। আমি জানি, ম্যানেজার তোমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে। ওর এখন আরো টাকার দরকার। টাকার লোভ দেখালেই ও রাজী হয়ে যাবে।

—কিন্তু শুধু ম্যানেজার রাজী হলেই তো হবে না। ফুচেরি যদি রাজী না হয়, ফুচেরিকে আমি কোন অনুরোধ করতে পারবো না।

নানা ভেবে দেখলো যে, কথাটা ঠিকই। ফুচেরির অমতে ম্যানেজার বোধ হয় ডাচেস্ হেলেনার পার্ট তাকে দেবে না।

নানার কিন্তু মনে হলো যে, কাউণ্ট যদি ফুচেরিকে অনুরোধ করেন, তা হলে ফুচেরি কিছুতেই সে অনুরোধ এড়াতে পারবে না।

কাউণ্টেসের সঙ্গে ফুচেরির সম্পর্কের কথা চিন্তা করেই ও কথা মনে হয়েছিল নানার। কিন্তু মনে হলেও কাউণ্টকে সরাসরি সে বলতে পারলো না ফুচেরিকে অনুরোধ করতে।

নানা তখন উঠে এসে কাউণ্টের কোলের উপর বসে তার ঠোঁটের নীচে নিজের ঠোঁট দুখানি তুলে ধরে বললো—তুমি তা হলে আমাকে ভালবাসো না। সেই জন্যই তো বললাম যে, টাকা দিয়ে ভালবাসা কেনা যায় না।

কাউন্টের মাথা ঘুরে গেল। নানার উষ্ণ নিঃশ্বাস লাগছে তাঁর মুখে। তিনি তখন নানাকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁট দু'খানিকে সজোরে চেপে ধরলেন নিজের ঠোঁট দিয়ে। নানাও প্রতিদান দিল কাউন্টের এই চুম্বনের। নানার গাঢ় চুম্বনের আবেশে চোখ দু'টি বুঁজে এলো কাউন্টের।

নানা তাঁকে জড়িয়ে ধরেই বললো—তোমার সেই বাড়ীখানি কোথায়, কাউন্ট ?

—এভিনিউ ছ ডিলিয়ার্স-এ।

—গাড়ী আছে সে বাড়ীতে ?

—আছে।

—আমি তোমার কাছে যাবো। আমি কথা দিচ্ছি, কাউন্ট। এবার আর আগের মত করবো না আমি। আমি আর কারো সঙ্গেই কোন সম্পর্ক রাখতে চাইব না। আমার যা কিছু সবই হবে তোমার—আমার যা কিছু সব —সব—সব !

এইভাবেই কাউন্ট মাফাত্‌কে দিয়ে কৌশলে ম্যানেজারের কাছ থেকে নায়িকার পার্টটি আদায় করে নিল নানা।

কিন্তু পার্ট পেলে কি হয় ? আসলে মোটেই ভাল অভিনয় করতে পারলো না সে।

দর্শকরা সবাই ছি-ছি করতে লাগলো নানার অভিনয় দেখে।

এগারো

কয়েকদিন পরেই নানা সেই নূতন বাড়ীতে উঠে এলো!

এই বাড়ীখানা ছিল প্যারীর সবচেয়ে অভিজাত পল্লীর ঠিক মাঝখানে।

স্থাপত্য-শিল্পের দিক থেকে বাড়ীখানাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে অর্থব্যয়ে কৃপণতা করেন নি কাউণ্ট মাফাত্।

এই বাড়ীর উপযুক্ত আসবাবপত্রও কিনে দিলেন কাউণ্ট নানার জন্য। বাড়ী, গাড়ী, দামী আসবাবপত্র, মহামূল্য অলঙ্কার! রাণীর মত জীবন যাপন করতে সুরু করে দিল নানা এই বাড়ীতে এসে।

এই সময়টাই নানার জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়। নানা যখন তার নিজস্ব গাড়ী হাঁকিয়ে রাস্তা দিয়ে চলতো, তখন তাকে একটিবার শুধু চোখের দেখা দেখবার জন্য রাস্তার ধারে জমা হতো অগণিত লোক। রাণীর মত চালে নানা গাড়ীতে বসে থাকতো আর রাস্তার দু'দিকে ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী, এমন কি বুড়ো-বুড়ীরা পর্যন্ত হাঁ করে তাকিয়ে থাকতো তার দিকে।

প্রত্যেক ছবির দোকানে তখন নানার ছবি ঝুলতে দেখা যেতো। খবরের কাগজে প্রায় রোজই বের হতো নানার খবর। নানা যে ধরণের পোশাক পরতো, প্যারীর অভিজাত ঘরের মহিলারা অনুকরণ করতো তার।

কাউণ্ট মাফাতের সঙ্গে নানার এই বলে একটা মৌখিক চুক্তি হয়েছিল যে, কাউণ্ট নানাকে প্রতি মাসে বারো হাজার ফ্রাঙ্ক করে দিবেন তার সংসার-খরচের জন্য। এ ছাড়া গহনাপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য ব্যয় বাবদ যা দরকার, সে তো দিবেনই।

এই বিরাট অঙ্কের টাকার বিনিময়ে নানার কাছ থেকে তিনি শুধু একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন লোকের সঙ্গে

নানা যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারবে না। ও ব্যাপারে কাউণ্ট-ই হবেন একমেবাদ্বিতীয়ম্।

অবশ্য এই প্রতিশ্রুতি দেবার আগে নানা কাউণ্টকে কবুল করিয়ে নিল যে, তিনি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই নানার বাড়ীতে থাকতে পারবেন। এই নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে নানা তার ইচ্ছামত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবে, কাউণ্ট তাতে কোনরকম বাধা দিতে পারবেন না।

মোট কথা, নানার উপরে তাঁকে অন্ধ বিশ্বাস রাখতে হবে প্রত্যেক ব্যাপারে। কথা হলো যে, যদি কোনদিন কাউণ্ট এই চুক্তির সর্ত না মানেন, তাহলে নানাও বাধ্য থাকবে না তাঁর সঙ্গে কোনরকম সম্বন্ধ রাখতে।

আসল ব্যাপার ছিল এই যে, বাপের বয়সী এই কাউণ্টকে নানা ভালবাসতো না মোটেই। এ যেন নিছক ব্যবসাদারি চুক্তি হলো ওদের দু'জনের মধ্যে।

এইজাতীয় চুক্তির পরিণাম যা হয়, নানার বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হ'লো না। সে গোপনে গোপনে প্রেমের কারবার চালাতে লাগলো তার দু'চারজন চেনা-জানা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে। এই অনুগৃহীত বন্ধুদের মধ্যে কাউণ্ট ভাঁদেভোও ছিল একজন।

এই ভাঁদেভো লোকটি নামে কাউণ্ট হলেও, আসলে সে ছিল ট্যাঁকখালির জমিদার। তার সম্পত্তির বেশির ভাগই সে ফুঁকে দিয়েছিল মেয়েমানুষের পেছনে। এই কাউণ্ট মশায়ের তখন একমাত্র আয়ের পথ ছিল ঘোড়দৌড়। খেয়ে না খেয়ে কয়েকটা ঘোড়া সে কিনেছিল, আর এই ঘোড়ার কল্যাণেই করে খাচ্ছিল সে। যোগাড়যন্ত্র করে টার্ফ ক্লাবের মেম্বারও সে হয়েছিল ঐ ঘোড়ার কল্যাণেই। কিন্তু ঘোড়দৌড়ের মাঠে সে যা কিছু রোজগার করতো, তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা সে ব্যয় করতো নানার বাড়ীতে।

এই কাউণ্ট-প্রবরটি ছাড়া আরও যে কয়েকজন লোকের আনাগোনা চলতো নানার বাড়ীতে, তাদের মধ্যে নাবালক জর্জও একজন। সেই ব্যাপারের

পর কিছুদিন মায়ের ভয়ে জর্জ বাড়ী থেকে বের না হলেও আবার সে আসতে স্বরু করেছিল।

এই ছোকরার আবার সময়-অসময় জ্ঞান ছিল না। যখন তখন হুট্ করে এসে হাজির হতো সে।

নানার বাড়ীতে জর্জের লুকিয়ে আসার কথা শুনে মাদাম্ হিউজেন একদিন তাঁর বড় ছেলে ফিলিপিকে বললেন জর্জকে একটু শাসন করতে। ফিলিপি কিন্তু জর্জকে নানার কথা বলতে যেতেই জর্জ ফোঁস করে উঠে বললো যে, নানার বাড়ীতে সে কোনদিন যায় না।

ফিলিপি তখন তাকে তাকে থাকলো জর্জকে ধরবে বলে।

একদিন দুপুরে জর্জ যখন নানার ঘরে বসে মশগুল হয়ে গল্প করছে, সেই সময় হঠাৎ তার দাদা ফিলিপি এসে নানার বাড়ীতে হানা দিল। ফিলিপির কণ্ঠ শুনেই জর্জের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হ'লো। নানার মুখের দিকে তাকিয়ে শুকনো মুখে জর্জ বললো—দাদা এসে পড়েছে! এখন উপায়?

নানা একটুখানি চিন্তা করে বললো—ঠিক আছে। তুমি বাইরে গিয়ে তোমার দাদাকে পাঠিয়ে দাও এখানে।

—কিন্তু দাদা যদি ধরে মারে?

—না, মারবে না। তুমি গিয়ে বলো যে, আমি ডেকেছি তাকে।

জর্জ ভয়ে ভয়ে নানার ঘর থেকে বের হতেই ফিলিপি কঠিন স্বরে ডাকলো—জর্জ!

আমতা আমতা করে ভয়ে ভয়ে জর্জ বললো—তোমাকে নানা একবার ডাকছে।

—আমাকে! আমার সঙ্গে তার কি দরকার?

—তা জানিনে।

ফিলিপির ইচ্ছা হলো নানাকে একবার দেখতে। সারা প্যারী শহরের লোকের মুখে আজ যে মেয়েটির নাম, তার সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেয়ে মনে মনে খুশীই হলো সে।

কিন্তু মনের ভাব ছোটভাইকে বুঝতে না দিয়ে মুখে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য এনে সে বললো—বেশ, আমি যাচ্ছি। তবে আমি না আসা পর্যন্ত তুমি এখান থেকে যেও না। তোমাকে আজ আমি এমন শিক্ষা দেবো, যাতে আর কোনদিন এ মুখো তুমি না হও।

এই বলে জর্জকে শাসিয়ে রেখে ফিলিপি নানার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে নানার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ফিলিপি। বাইরে এসে জর্জের দিকে না তাকিয়েই সে সিঁড়ির দিকে চলতে লাগলো হন হন করে।

জর্জ বুঝতেই পারলো না তার দাদার এই ভাবান্তরের কারণ।

সে তখন কতকটা আশ্বস্ত হয়ে নানার ঘরে ঢুকে তাকে জিজ্ঞাসা করলো—কি ব্যাপার? দাদা যে আমাকে কিছু না বলেই চলে গেল?

—ও আর কিছু বলবে না তোমাকে।

কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারলো না জর্জ।

এই ঘটনার পর থেকে ফিলিপিও সমানে যাতায়াত সুরু করলো নানার বাড়ীতে। নানার বাড়ী যেন তীর্থক্ষেত্র।

তীর্থক্ষেত্রে যেমন বাপ-ছেলে, দাদা-ছোটভাই সবাই একসঙ্গে মাথা মুড়ায়, নানার বাড়ীতেও সেই অবস্থা। নানার দেহতীর্থে ফিলিপি আর জর্জ দু'ভাই-ই মাথা মুড়ালো।

ক্রমে ওরা দু'জনে যেন ইয়ার হয়ে উঠলো একে অন্যের।

একদিকে যখন এইসব চলছে, অন্যদিকে চলছে তখন কাউণ্ট মাফাত্‌কে পুরোপুরিভাবে দোহন। নানার আবদার দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

আজ এটা চাই, কাল ওটা চাই এইভাবে কাউণ্টের ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স হালকা করতে লাগলো নানা।

কাউণ্টও নানার প্রেমে এমনই মশগুল যে, নানার প্রতিটি আবদার, তা সে যত অসঙ্গত আর ব্যয়সাপেক্ষই হোক্ না কেন, পূর্ণ করতে দ্বিধা করতেন না তিনি। নানার মুখের একটুকরো হাসির বিনিময়ে যথাসর্বস্ব খোয়াতেও তিনি রাজী।

অবস্থা যখন এইরকম, সেই সময় একদিন একখানা বেনামী চিঠি পান তিনি। পত্রলেখক কাউণ্টকে জানিয়েছিল যে, নানা তাঁরই দেওয়া বাড়ীতে বসে আর তাঁরই টাকায় যাবতীয় খরচ চালিয়ে, গোপনে গোপনে জর্জ আর ফিলিপির সঙ্গে প্রেম চালাচ্ছে।

কাউণ্ট নানাকে এই কথা বলতে সে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে সটান শুনিয়ে দিল—এতই যদি সন্দেহ, তা হলে আমার কাছে না এলেই তো হয়। তুমি জানো যে, জর্জ ছোকরাকে আমি নিজের ছোট ভাইয়ের মত দেখি, কিন্তু তা সত্ত্বেও কি করে যে তুমি এইরকম হীন ধারণা করতে পারলে, তা আমি ভেবেই পাই না। ছিঃ!

নানার এই কথার পর কাউণ্ট আর কিছু বলতে সাহস পেলেন না। কাউণ্টকে চুপ করে যেতে দেখে নানাও বুঝে নিল যে, কাউণ্ট তার হাতের মুঠোয় এসে গেছেন তখন।

বারো

এত বিলাস-প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও প্রতি রবিবার নানা তার মাসীর বাড়ীতে যেতো ছেলেটাকে দেখতে। ছেলেটার জন্য নানার মনে দুঃখের সীমা ছিল না। লুই ছিল চিররুগ্ন। বয়স তার তিন পেরিয়ে চারে পড়লেও সে একেবারেই বাড়ছিল না। এটা সেটা অসুখ লেগেই ছিল। কিছুদিন আগে তার পিঠে এক্‌জিমা হয়ে ঘাড় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেকরকম ঔষধপত্র দিয়েও কিছুতেই সারছিল না। ছেলের গায়ে বিশ্রী ঘায়ের হলদে হলদে দাগগুলো দেখে বাড়ীতে এসে সে নিজের শরীরটা ভাল করে দেখতো। নিজের দেহে কোনরকম দাগ দেখতে না পেয়ে সে ভাবতো—আমার শরীরে যখন কোনরকম অসুখ নেই, এ অবস্থায় ছেলের ঐরকম বিশ্রী অসুখ করলো কেন?

রবিবার সকাল হলেই নানা তার মাসীর বাড়ীতে চলে যেতো। বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিতা, প্যারী নগরীর সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা প্রতি রবিবারে মাদাম্ লিরাতের বাড়ীতে আসায় মাদামের সে কি গুমোর! নানা চলে গেলে পাড়ার মেয়েদের ডেকে সে বলতো—এবারে নানা যে পোশাকটা পরে এসেছিল, তার দাম কত জান? ওটার দাম পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক। নানার গাড়ীখানা দেখেছ তো? প্যারীতে ও রকম গাড়ী কখানা আছে?

পাড়া-পড়শীদের কাছে নানাকে নিয়ে এইভাবে গর্ব করলেও মাদাম্ কিন্তু নানার বাড়ীতে যেতে চাইতো না। নানা তাকে অনেকবার বাড়ীতে যেতে বললেও সে ওখানে যেতে চাইতো না। একদিন মাত্র গিয়েই তার আক্কেলগুড়ুম হয়ে গিয়েছিল। ওখানকার আমিরী চালচলনের সঙ্গে নিজেকে সে খাপ খাওয়াতে পারতো না। কিন্তু সে না গেলেও নানা ঠিকই আসতো। প্রতি রবিবার সকাল বেলায় নানার বহুমূল্য ল্যাণ্ডোখানা এসে দাঁড়াতো

মাদাম্ লিরাতের বাড়ীর দরজায়। আসবার সময় নানা অনেকরকম উপহার আর খেলনা নিয়ে আসতো ছেলের জন্য। রবিবার সারাটা দিন ছেলের কাছে থেকে সন্ধ্যার দিকে সে ফিরে যেতো। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হ'তে পারত-পক্ষে দিতো না সে।

এমনি এক রবিবারে মাসীর বাড়ী থেকে ফিরবার পথে রাস্তায় সাটিনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল নানার। সাটিন একটা ছেঁড়া জামা পরে রাস্তা দিয়ে চলেছিলো। তার পায়ে মোজা ছিল না। জুতোজোড়ার অবস্থাও ছিল শোচনীয়। এমন অবস্থার কোন মেয়ের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। কিন্তু নানার দৃষ্টি তার দিকে পড়তেই সে চীৎকার করে ডাকলো—সাটিন! সাটিন শোনো। এদিকে এসো।

সাটিন বোকার মত এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে আবার চলতে লাগলো। বিরাট একখানি ল্যাণ্ডোতে বসে বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিতা কোন মহামাননীয়া মহিলা যে তাকে ডাকতে পারে, সেকথা ভাবতেই পারেনি সাটিন।

কিন্তু সে যা ভাবতে পারেনি, তা-ই হলো। নানার গাড়ী সাটিনের কাছে এলে নানা আবার ডাকলো—সাটিন! আমার গাড়ীতে উঠে এসো।

গাড়ীখানা নানার আদেশে থামিয়ে ফেলেছিল কোচম্যান। সাটিন নানাকে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললো—নানা! কি আশ্চর্য!

নানা বললো—দেরি করো না সাটিন, শীগ্‌গির উঠে পড়ো।

সাটিন গাড়ীতে উঠে নানার পাশে বসলো।

মহামূল্য অলঙ্কার ও আভরণে সজ্জিতা প্যারীর শ্রেষ্ঠতমা সুন্দরী নানার পাশে বসে এক দীনা, জীর্ণপোশাক-পরিহিতা পথের মেয়ে—যার দিকে মুখ ফিরিয়েও কেউ দেখতো না, পুলিশ যার পেছনে ফেউয়ের মত লেগে থাকতো, কদর্যতম পল্লীতে দেহ বিক্রি করে দিন চলতো যার।

রাস্তার লোকেরা হাঁ করে দেখতে লাগলো এই উপভোগ্য দৃশ্য।

সাটিন বললো—তুমি খুব বড়লোক হয়েছে নানা, তাই না?

নানা হেসে বললো—তা হয়েছি ; কিন্তু তোমার কাছে আমি সেই আগের নানাই আছি। তোমাকে আমি ছাড়বো না। আমার কাছেই তুমি থাকবে আজ থেকে।

—কিন্তু কেউ যদি কিছু বলে ?

—কে কি বলবে ? আমার মুখের উপরে কথা বলবে, এরকম সাহস আছে কার ?

বাড়ীতে এসে সাটিনকে বাথ-রুমে নিয়ে গিয়ে ভাল করে স্নান করালো নানা। খেতে না পেলেও দেহে যৌবন ছিল সাটিনের। তাই স্নানের ঘরে বন্ধুকে নিজহাতে স্নান করাতে করাতে ঠাট্টা-ইয়ারকি করছিল নানা। তারপর নিজের একসেট দামী পোশাক সাটিনকে পরিয়ে পরিপাটি করে প্রসাধন করে দিল তার। প্রসাধন হয়ে গেলে সাটিনের মুখের দিকে তাকিয়ে নানা হেসে বললো—এইবার ছাখো তো সাটিন, কেমন দেখাচ্ছে তোমাকে !

সাটিন আয়না নিয়ে রাণীর মত সাজসজ্জায় নিজেকে দেখে আনন্দে নানাকে জড়িয়ে ধরে তার গালে চুমো দিয়ে ফেললো ছোট্ট শিশুটির মত।

নানা খুশী হয়েছিল সাটিনকে পেয়ে।

সাটিন কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠলো। নানার বাড়ীর আমিরী আবহাওয়া এবং সার্বোপরি প্রতি ব্যাপারে বাঁধা-ধরা নিয়ম সাটিনের ভাল লাগতো না। তার মনে হ'তো, সে যেন বন্দিজীবন যাপন করছে। এর চেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ঢের ভাল। সন্ধ্যার পরে কামাতুর পথিককে প্রলুব্ধ করে নিয়ে আসতে তার সেই বেপরোয়া চালচলন, পুলিশ দেখে প্রাণপণে ছুট—সেই জীবনটাই যেন এর চেয়ে কাম্য মনে হ'তো সাটিনের।

তাই সে একদিন কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে গেল নানার বাড়ী থেকে।

নানা ক্ষেপে উঠলো সাটিনকে দেখতে না পেয়ে। চাকর-বাকরদের যাচ্ছে-তাই গালাগালি দিতে লাগলো সে। এমন কি, জো আর ফ্রান্সিসকেও পাঁচ কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়লো না সে।

সে বললো—আমার বন্ধু গরীব বলে তোমরা সবাই মিলে যুক্তি করে ওকে তাড়িয়েছো।

এইভাবে কিছুক্ষণ চীৎকার-চেঁচামেচি করে কোচম্যানকে ডেকে গাড়ী বের করতে বললো সে। গাড়ীতে চড়ে সে নিজেই চললো সাটিনের খোঁজে। গাড়ীতে বসে কিন্তু তার সব রাগ গিয়ে পড়লো সাটিনের উপরে।

পথের কুকুরের মত যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাকে ডেকে এনে রাণীর হালে সে রেখেছিল। নানা মনে মনে বললো—কুকুরের পেটে কি ঘি সহ্য হয়? কুকুরকে যত ভাল খাবারই দাও, জুতোর চামড়া দেখলেই তার জিভে জল আসবে।

এইসব কথা চিন্তা করতে করতে মাথা গরম হয়ে উঠলো নানার। সে ভাবলো যে, যদি সাটিনকে সে আজ দেখতে পায়, তা হলে তার গালে আচ্ছা করে দু'টো চড় কষে দেবে।

নানা জানতো সাটিনের কোথায় আড্ডা। শহরতলীর একটা নিম্নশ্রেণীর রেস্তোরাঁয় সাটিনের মত মেয়েরা জমায়েত হ'তো, সে খবর নানার ভাল করেই জানা ছিল। তাই সে সোজা সেই রেস্তোরাঁয় গিয়ে হাজির হলো।

সাটিন এখানেই ছিল তখন। নানাকে দেখে সে হেসে উঠে বললো—আমি চলে এসেছি, নানা।

নানা কিন্তু কিছুই বললো না তাকে। সে নিঃশব্দে সাটিনের পাশের চেয়ারে বসে খাবার আর মদ আনতে হুকুম দিল।

এই সময় হঠাৎ ড্যাগনেট এসে হাজির হলো সেখানে। ড্যাগনেটের মত নারী-শিকারীদের অনেকেই আসতো সেই রেস্তোরাঁয়। ড্যাগনেট হয়তো ভেবেছিল যে, শহরতলীর এই নগণ্য পল্লীতে এসে ডুবে ডুবে জল খেলে উপরতলায় 'একাদশী'রা তা জানতেও পারবে না। কিন্তু নানাকে ঐ রেস্তোরাঁয়

দেখে সে হকচকিয়ে গেল। লুকিয়ে পড়বার কোনই উপায় নেই দেখে সে নানার কাছে গিয়ে বসলো—এই যে মাদাম্! আপনিও দেখি এখানে এসেছেন!

নানা বললো—তা তো দেখতেই পাচ্ছো।

ড্যাগনেট বললো—আপনার টেবিলে বসবার অনুমতি পেতে পারি কি?

—অনুমতির কোন প্রশ্নই ওঠে না এখানে। কারণ, এটা পাবলিক রেস্তোরাঁ। তুমি যেখানে খুশী বসতে পারো।

নানার পাশের চেয়ারেই বসলো ড্যাগনেট।

তার পরেই সুরু হ'লো পান-ভোজনের পালা।

কথায় কথায় ড্যাগনেট নানাকে অনুরোধ করলো এস্টেলের সঙ্গে তার বিয়ের ব্যাপারে কাউন্টকে অনুরোধ করতে।

মদের মুখে নানাও কথা দিল যে, এ বিয়ে যাতে হয়, তা সে করবে।

দেখতে দেখতে নানার চেনা-জানা আরও অনেকে এসে জুটলো সেখানে। ব্লান্সি, টাটান, গাগা, রোজি, হেকৃতর এবং আরো অনেকে।

সবাই এসে নানাকে ঘিরে ধরলো।

গাগা বললো—আজ আমাদের মদের বিল দেবে নানা, কি বলো?

নানা হেসে বললো—বেশ তো! খাও না যত খুশী।

এমনিভাবে পুরোনো বন্ধুদের আপ্যায়িত করে সাটিনকে ধরে নিয়ে চললো নানা।

গাড়ীতে উঠে সাটিনকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে অভিমানের সুরে নানা বললো—আমাকে না বলে চলে এলে কেন, সাটিন?

সাটিন বললো—তোমার বাড়ীর ঐ রকম অমিরী চালচলন কেন যেন বরদাস্ত হয় না আমার।

কয়েকদিন পরের কথা।

সেদিন নানার বাড়ীতে একটা ছোটখাটো ডিনার-পার্টির মত ছিল।

নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল কাউণ্ট মাফাত্, কাউণ্ট ভাঁদেভো, জর্জ, আর ফিলিপি।

টেবিলে বসেছিল নানা, সাটিন আর নিমন্ত্রিতরা।

খানা দেওয়া হলে গল্পগুজব আরম্ভ হয়ে গেল ওদের মধ্যে।

কাউণ্ট ভাঁদেভো একটা গুরু-গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করে বসলো।

সে বললো—রিপাবলিকান্‌রা সর্বশেষ বক্তৃতায় কি বলেছে, শুনেছেন ?

প্রশ্নটা সে কাউণ্ট মাফাত্‌কেই করেছিল।

কাউণ্ট মাফাত্ বললেন—হ্যাঁ, পড়েছিলাম বটে কাগজে। কি যে বলতে চায় এই পাগলের দল, তা বুঝি না।

এই সময় নানা বললো—ওদের বোধ হয় বাড়ীতে কোন কাজ-কর্ম নেই। তাই মাঠে গিয়ে গলাবাজি করে। আরে বাপু, মাঠে গলাবাজি করলেই যদি সম্রাট ভয় পেয়ে যেতেন, তাহলে আর এত বড় সাম্রাজ্য তিনি চালাতে পারতেন না।

জর্জ বললো—কিন্তু ওদের কথার মধ্যে যুক্তি আছে।

জর্জের কথায় তার দাদা ধমকে উঠে বললো—আরে রেখে দাও তোমার যুক্তি। যুক্তি চোর-ডাকাতের কথাতেও থাকে অনেক সময়। এই সব সাংঘাতিক লোকদের ধরে ফাঁসী দেওয়া উচিত।

নানা বললো—কিন্তু এদের এত বাড়াবাড়ি করতে কেন যে দেওয়া হচ্ছে, তা বুঝি না। শেষে একটা অনর্থ না বাধায় এই নিষ্কর্মার দল।

কাউণ্ট মাফাত্ বললেন—এদের সম্বন্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা-অবলম্বনের কথা চিন্তা করা হচ্ছে।

এই সময় রোস্ট পরিবেশন করা হ'লো।

রোস্ট খেতে খেতে সাটিন হয়তো ভুলে গেল স্থান-কাল-পাত্র। সে হঠাৎ বলে উঠলো—ভিক্টরের কথা মনে আছে, নানা? সেই যে! আমাদের ধরে নিয়ে যে লোকটা সেলারে বন্ধ করে রাখতো? তা ছাড়া, তোমাদের বাড়ীর সেই বুড়ীটা—সব সময়েই যে একটা ঝাঁটা হাতে নিয়ে থাকতো?

নানা বললো—বুঁচি মা'র কথা বলছো? সে মারা গেছে।

সাটিন বললো—তোমাদের সেই দোকানটার কথা আমার এখনও মনে আছে। কি মোটাই ছিল তোমার মা! এক রাত্রিতে আমরা যখন খেলছিলাম, সেই সময়ে তোমার বাবা বাড়ীতে এলো পাঁড় মাতাল হয়ে, মনে আছে?

নানা আর সাটিনের এইজাতীয় ছোটলোকী কথাবার্তা বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে কাউণ্ট ভাঁদেভো হঠাৎ বলে বসলো—আমাকে আর একটা কাটলেট দিতে বলো তো। সত্যি, কাটলেটটা খুবই চমৎকার হয়েছে।

কথায় বাধা পেয়ে নানা কিছুটা বিরক্ত হয়ে জো-কে ডেকে বললো—এই জো! এখানে কয়েকটা কাটলেট দিতে বল।

এই বলেই আবার সে আগের কথায় ফিরে গেল। সাটিনের দিকে তাকিয়ে সে বললো—সত্যি ভাই! বাবাটা বড্ড বোকা ছিল। মদ খেলে আর কোন জ্ঞান থাকতো না তার। আর থাকবেই বা কি করে? মদ তো আর রোজ জুটতো না। আমাদের সেই দিনের কথা মনে হলে দুঃখ হয়, বুঝলি সাটিন। বাবা-মা আমার কত দুঃখ পেয়ে গেছে! আজ যদি ওরা বেঁচে থাকতো, তা হ'লে দুটো ভালমন্দ খেতে পারতো।

কাউণ্ট মাফাত্ বিব্রত হয়ে ওঠেন এইজাতীয় কথাবার্তায়। এ ধরণের ছোটলোকী আলাপ-আলোচনায় যোগ দিতে তিনি একেবারেই অভ্যস্ত নন। তিনি কতকটা বিব্রত এবং কতকটা বিরক্ত হয়ে একখানা 'টেবিল নাফপ' হাতে করে নাড়াচাড়া করছিলেন।

শেষে আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলে উঠলেন—এ সব কথাবার্তা পরে হলে ভাল হ'তো নাকি?

নানা বললো—কি বললে? এ সব কথা ভাল লাগছে না তোমাদের? সত্যিই তো, কি করেই বা ভাল লাগবে এ সব কথা! তোমরা তো গরীবদের চিরকাল ঘৃণা করেই এসেছো। দয়া করে এক টুকরো রুটি বা একটা পয়সা

ছুঁড়ে দিয়ে আমিরী দেখিয়েছো, কিন্তু তাদের কথা নিয়ে সময় নষ্ট করবার মত সময় তোমাদের কোথায় ?

এই বলে একটু চুপ করে থেকে নানা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললো— আমার পরিচয় কিন্তু তোমাদের মত মাননীয়দের সঙ্গে মিশবার মত নয়, তা জানো ? আমার মা ছিল ধোপানী। বাবা ছিল পাঁড় মাতাল। বস্তিতে বাস করতাম আমরা। তোমাদের মত বড় লোকেদের জামা-কাপড় ধুয়ে, আর ইস্তিরি করে আমাদের দিন চলতো, শুনলে তো! এই বারে ভেবে ছাখো, তোমরা এর পরে আমার এখানে খাবে কি না। তোমরা যদি আমার পারিবারিক পরিচয় শুনে ঘৃণা বোধ কর, তা হলে তোমরা স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারো। চলে যাবার দরজা খোলা আছে সর্বদাই।

নানার এই স্পষ্ট কথায় সবাই এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। কিন্তু গেল না কেউই।

ওরা কেউই গেল না দেখে নানার জেদও যেন বেড়ে গেল। সে তখন পঞ্চমুখে তার বিগত জীবনের কাহিনীগুলো বর্ণনা করে চললো। কবে কোন্ রেস্তোরাঁয় কি হয়েছিল, থিয়েটারে নামবার পর ছোকরার দল কিভাবে তার পেছু নিতো, সেই সব কাহিনী সালঙ্কারে বর্ণনা করতে সুরু করলো নানা।

নানার বিগত দিনের এইসব কাহিনী শুনে বাড়ীর ঝি-চাকররাও উৎফুল্ল হয়ে উঠলো—নানাকে তাদেরই দলের একজন ভেবে নিয়ে। নানার পরিচারিকাদের অন্যতমা জুলিয়ান তো একেবারে নানার টেবিলের উপরেই ঝুঁকে পড়লো।

জুলিয়ানের এইরকম অন্তরঙ্গ ভাব দেখে নানার আত্মসম্মানবোধ জেগে উঠলো। বেশ একটু বিরক্তভাবেই সে বললো—এখানে দাঁড়িয়ে কি করছো ? স্যাম্পেন দাও না অতিথিদের।

নানার কথা শুনে জুলিয়ান তাড়াতাড়ি স্যাম্পেনের বোতল নিয়ে এসে পরিবেশন করতে আরম্ভ করলো, আর ফ্রান্সিস এগিয়ে দিতে লাগলো ফলের

ডিশ্‌গুলো। হঠাৎ একটা ফলের ডিশ্‌ তার হাত থেকে ফসকে পড়ে টেবিলময় আপেল আর আঙ্গুরে ছড়াছড়ি হয়ে গেল।

নানা চীৎকার করে উঠলো—কি হচ্ছে এসব ?

ফ্রান্সিস নিজের দোষ ঢাকতে গিয়ে বলে উঠলো—আমার কি দোষ ? জো যে রকম বিশ্রীভাবে ডিশ্‌ সাজিয়ে দিয়েছে, তাতেই তো পড়ে গেল।

নানা বললো—তুমি যেমন উল্লুক, আর জো-ও হয়েছে সেইরকম গাধা।

জো তখন "কিন্তু মাদাম্‌" বলে কিছু বলতে চেষ্টা করতেই নানা হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার করে বললো—খুব হয়েছে, এবারে তোমরা দয়া করে দূর হও আমার সামনে থেকে।

নানা রেগে গেছে দেখে ঝি-চাকররা ওখান থেকে সরে পড়লো।

এই সময় সাটিন হঠাৎ আর এক কাণ্ড করে বসলো। সে একটা আপেল হাতে নিয়ে নানার কাছে গিয়ে তার কানে কানে কি বলতেই নানা একেবারে হি হি করে হেসে উঠলো। এর পর সাটিন সেই আপেলটার একটা দিক কামড়ে ধরে নানার মুখের কাছে নিয়ে যেতেই নানাও কামড়ে ধরলো আপেলের বাকী অংশটা। ওরা এমনভাবে কামড়ে ধরেছিল আপেলটাকে, যাতে তু'জনের ঠোঁট একত্র হয়ে গেল। এইভাবে আপেল নিয়ে ওদের চুমু খাওয়া-খাওয়ি দেখে ফিলিপি চট করে উঠে গিয়েই সাটিনের কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে তার আসনে নিয়ে বসিয়ে দিল।

ফিলিপির কাণ্ড দেখে নানা হেসে উঠে বললো—এটা কি হ'লো, মশাই ? দেখছো না বান্ধবী আমার কি রকম লজ্জা পেয়ে গেছে !

ফিলিপি বললো—তুমি আবার কেন এ দিকে নজর দিচ্ছো ? এটা আমার ব্যাপার, এ ব্যাপারে সবাই চোখ বুজে থাকবে আশা করি। কি বলেন কাউণ্ট ?

কাউণ্ট মাফাত্‌ গম্ভীর হয়ে বললেন—তা তো বটেই।

এর কিছুক্ষণ পরেই কফি পরিবেশন করা হ'লো অতিথিদের। কফির ব্যবস্থা হয়েছিল দোতলার ঘরে।

কফি-পান শেষ হতেই সাটিন উঠে গিয়ে ঘরের মধ্যে একখানা চেয়ারের উপরে গা এলিয়ে দিল। সাটিনের এইরকম ছোটলোকী ব্যবহারে সবাই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। ভাঁদেভো, জর্জ আর ফিলিপি তো তাকে শুনিয়ে শুনিয়েই যাচ্ছেতাই বলতে সুরু করলো। ওদের বচন শুনে সাটিন হঠাৎ কেঁদে উঠে নানাকে বললো—ওদের এখান থেকে চলে যেতে বলো, নানা!

নানা জর্জকে ডেকে বললো—কি হচ্ছে জর্জ? তোমরা এদিকে এসো দেখি!

ওরা চলে আসতে সাটিনও উঠে ভিতরের ঘরে চলে গেল। তার মোটেই ভাল লাগছিল না এই সব লোক-দেখানো আদব-কায়দা।

সাটিন ভিতরে চলে গেলে ওরা তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে গল্প করতে সুরু করলো। কথায় কথায় আবার উঠলো রিপাবলিকান্‌দের কথা।

নানা এই রিপাবলিকান্‌দের কেন যেন দু'চোখে দেখতে পারতো না। ভাঁদেভোর একটা কথায় সে হঠাৎ বলে উঠলো—চুলোয় যাক্ ঐ হা-ঘরের দল। ওদের ইচ্ছামত রিপাবলিক হলে কি দেশের মঙ্গল হবে মনে করো তোমরা?

এই সময় সাটিন আবার হঠাৎ ফিরে এলো ওখানে।

সে এসেই নানাকে ডাকলো—নানা, একটু শুনে যাও তো এদিকে!

নানা উঠে তার কাছে গিয়ে বললো—কেন, কি হয়েছে?

—জো খুব কাঁদছে দেখে এলাম।

—জো কাঁদছে! কেন বলো তো?

—তুমি তাকে গাধা বলে গালি দিয়েছিলে সেই জন্য। আমি তাকে অনেক করে বোঝালাম, কিন্তু তার কান্না কিছুতেই থামছে না। তুমি একবার চলো না!

নানা তখন সাটিনের সঙ্গে ভিতরে গিয়ে দেখতে পেলো যে, সত্যিই জো কাঁদছে। নানা বললো—কি হয়েছে জো? কাঁদছিস কেন?

জো নানার কথার কোন উত্তর না দিয়ে আরও জোরে কেঁদে উঠলো। নানা তখন অনেকরকম মিষ্টি কথা বলে জোকে শান্ত করতে চেষ্টা করেও যখন কিছু হ'লো না, তখন সে ঘরে গিয়ে নিজের একটা দামী পোশাক এনে জো-কে

দিয়ে বললো—এই নে জো! আর কাঁদিস নে তুই। তোর কান্না দেখে আমার খুব কষ্ট হয়।

যে পোশাকটা জোকে উপহার দিল নানা, তার দাম কম পক্ষে দু'হাজার ফ্রাঙ্ক।

জো তখন একহাতে পোশাকটা ধরে অন্যহাতে চোখের জল মুছতে মুছতে বললো—দিদিমণি, তুমি সত্যিই খুব ভাল।

জোকে এইভাবে ঠাণ্ডা করে নানা আবার ফিরে এলো অতিথিদের কাছে। রাত তখন অনেকটা হয়েছিল। একে একে সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেলেও কাউণ্ট মাফাত্ কিন্তু যাবার নামও করছিলেন না। অন্যান্য লোক চলে গেলে তিনি বেশ একটু খুশী মনেই নানাকে বললেন—তা হলে আর দেরি কেন, নানা? চলো, শোওয়া যাক্।

নানা বললো—আজ থাক। আজ আমার শরীরটা ভাল নেই। কাউণ্ট কিন্তু নাছোড়বন্দা। তিনি কিছুতেই যেতে চান না। নানা তখন অনেকটা দায়ে পড়েই কাউণ্টের প্রস্তাবে সাড়া দিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই সাটিন তাকে বাধা দিল ডেকে। সাটিনের ডাকে নানা বিছানা ছেড়ে উঠে যেতে যেতে কাউণ্টকে বললো—আজ থাক লক্ষ্মীটি, দেখছো না—বাধার পর বাধা। আজ তুমি যাও; কেমন?

মনের আশা মনেই চেপে রেখে কাউণ্ট মাফাত্ যখন বাড়ী থেকে বের হয়ে গেলেন, সাটিন তখন হঠাৎ নানাকে জড়িয়ে ধরে একেবারে খিল খিল করে হেসে উঠে বললো—চল্ নানা, জানালায় দাঁড়িয়ে দেখি, বুড়োটা কি করে!

এই সময় একদিন ঘোড়দৌড়ে যেতে ইচ্ছা হলো নানার। হঠাৎ তার রেসে যাবার ইচ্ছা হবার কারণ এই যে, সেদিন নাকি 'নানা' নামে একটা ঘোড়া দৌড়াবে।

'নানা' কি রকম দৌড়ায় দেখতে নানা সেদিন একটু সকাল সকালই স্নানাহার সেরে নিয়ে প্রসাধন করতে বসলো। প্রসাধনান্তে নানা তার ল্যাণ্ডোখানায় চারটি সাদা রঙের তেজী ঘোড়া জুড়ে বেরিয়ে পড়লো। নানার এই গাড়ীখানাকে প্যারীর প্রত্যেকেই চিনতো। কারণ, ঐ রকম সাদা ঘোড়াওয়ালা সুদৃশ্য ও মূল্যবান গাড়ী প্যারীতে আর কারো ছিল না তখন।

নানা যখন মাঠে গিয়ে হাজির হ'লো, দৌড় আরম্ভ হতে তখনও অনেক দেরি আছে। কিন্তু তা সত্বেও মাঠ তখন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। নানা তার গাড়ীতে বসেই জর্জ আর ফিলিপির সঙ্গে গল্পগুজব সুরু করে দিল। বলা বাহুল্য, জর্জ আর ফিলিপি দুভাই-ই নানার গাড়ীতে এসেছিল।

কথায় কথায় নানা হঠাৎ বলে ফেললো—কাউণ্ট লোকটা আমাকে একেবারে জ্বালিয়ে মারলে, ভাই!

ফিলিপি বললো—কেন বলো তো?

—আরে ভাই, সব সময় কি বকর-বকর সহ্য হয়? লোকটা আমার বাড়ীতে এলেই বক্ বক্ সুরু করে দেয়। আর শুধুই কি বক্‌বকানি? মাঝে মাঝে আবার প্রার্থনাও সুরু করে মাঝরাতে উঠে।

ফিলিপি হাসতে হাসতে মন্তব্য করে—ঐ জন্যই তো কাউণ্টেস দুচোখে দেখতে পারে না ওকে।

ওদের যখন এইসব কথা হচ্ছে, সেই সময় রোজিকে দেখা গেল একখানা গাড়ী করে ওদের দিকে আসতে।

নানার দৃষ্টি সেদিকে পড়তেই সে বললো—খ্যাখো তো জর্জ, রোজি নাকি?

জর্জ বললো—হ্যাঁ।

রোজির গাড়ীর পেছনেই আর একখানা গাড়ীতে দেখা গেল লা-বোর্দেত, ক্লারিসি, গাগা আর ব্লান্সিকে।

নানা জানতো যে, লা-বোর্দেত্ একজন পাকা রেসারু, তাই সে জর্জকে বললো—যাও তো জর্জ, লা-বোর্দেত্‌কে একবার আমার নাম করে ডেকে নিয়ে এসো!

নানার হুকুম শোনামাত্রই জর্জ ছুটলো লা-বোর্দেত্‌কে ডাকতে।

লা-বোর্দেত্ এলে নানা বললো—'নানা'র কি দর চলছে আজ?

—তা মন্দ না। পঞ্চাশ!

ঠোঁট উল্টে নানা বললো—মোটে! আমি তাহলে আজ 'নানা'কে ব্যাক্ করবো না, কি বলো?

লা বোর্দেত্ বললো—তবে কি লুসিগ্‌নানের উপরে ধরতে চাও আজ?

—হ্যাঁ। আমার মনে হচ্ছে আজকের বাজী 'লুসিগ্‌নান'ই মারবে।

এই সময় কাউন্ট ভাঁদেভোকে ওদের দিকে আসতে দেখে নানা উৎফুল্ল হয়ে বললো—ঐ যে, ঘোড়ার মালিক নিজেই আসছে। ডাকো তো ওকে!

কাউন্ট ভাঁদেভো কাছে এলে নানা জিজ্ঞাসা করলো—আজ কোন্ ঘোড়াকে ব্যাক্ করা যায় বলতো, কাউন্ট?

—তোমার কি ইচ্ছে?

—আমার তো ইচ্ছে লুসিগ্‌নান, কিন্তু তুমি কি বলো?

—লুসিগ্‌নান যখন আমার ঘোড়া, তখন আমার কিছু বলা কি ঠিক হবে?

—বুঝেছি! তুমি কিছু বলতে চাও না। বেশ! তাহলে কোন্ ঘোড়ার কি দর চলছে, সেই খবরই বলো।

—দর ? তা 'স্পিরিট'—তিন, 'ভ্যালেরি'—তিন, 'কসমস্'—পঁচিশ, 'হ্যাজার্ড'—পঞ্চান্ন···

নানা বললো—নাঃ! ওগুলোর একটাও না। আমি আজ তোমার লুসিগ্নানের উপরেই ধরবো।

ভাঁদেভো নানার কথার কোন উত্তর না দিয়ে মাঠের দিকে চলে গেল। তাকে দেখে নানার কিন্তু মনে হ'লো যে, সে খুব চিন্তিত।

এই সময় সাইমনিকে পাশে নিয়ে স্টিনারের গাড়ীখানাকে আসতে দেখা গেল।

গাড়ীখানা বেশ দামী বলেই মনে হ'লো নানার।

নানা লা-বোর্দেত্‌কে বললো—স্টিনার দেখছি ভোল পাল্টেছে এবার! মেরেছে নাকি কিছু?

ল-বোর্দেত্‌ বললো—সে খবর জানো না বুঝি? ও যে এক নূতন কোম্পানী খুলে বসেছে!

—তাই নাকি! কিসের কোম্পানী?

—ইন্টারন্যাশনাল ট্রেট ডেভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশন।

—সে আবার কি?

—সে এক আজব কোম্পানী। ও নাকি সুড়ঙ্গ-পথে মাল-চলাচলের ব্যবস্থা করবে। মোটা টাকার শেয়ার এর মধ্যেই বেচে ফেলেছে ও।

নানা বললো—যাক গে ওসব কথা। এখন বাজী ধরবার কথা চিন্তা করা যাক্, কি বলো?

—ঠিক। কিন্তু আমি ভাবছি যে, ভিড়ের জন্য তুমি টিকিট কাটতে পারবে কি? তুমি বরং তোমার টাকাগুলো আমার হাতে দাও, আমিই ধরছি তোমার হয়ে।

—তা মন্দ বলোনি। টাকাগুলো বরং তুমিই রাখো। তবে দেখো, 'নানা'র উপরে যেন বাজী ধরে বসো না। ওটা একেবারেই বাজে!

নানার এই কথায় আশেপাশের অনেকেই হো হো করে হেসে উঠলো।

রেসের মাঠে নানা তার চেনা-জানা প্রায় সবাইকেই দেখতে পেলো। হেক্তর, লুসি, গাগা, টাটান, এমনকি থিয়েটারের ম্যানেজারকেও। ম্যানেজার বেচারার অবস্থা তখন খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল। লোকসান দিয়ে দিয়ে থিয়েটার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিল সে। একটা আধ-ময়লা কোট পরে মাঠে এসেছিল বেচারা।

ম্যানেজারের অবস্থা দেখে নানার দুঃখ হ'লো।

সে তখন ফিলিপিকে পাঠিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে এসে খাতির করে এক পেগ্ মদ খেতে দিয়ে বললো—কেমন চলছে তোমার আজকাল?

—আর কেমন চলছে! তুমি চলে যাবার পর থেকেই আমারও কপাল ভেঙ্গেছে।

—তাই নাকি?

—নয় তো কি! লোকে কি থিয়েটার দেখতো যেতো নাকি? 'ভ্যারাইটি'তে যারা যেতো, তারা সবাই যেতো তোমাকে দেখতে।

দৌড় আরম্ভ হয়ে গেল।

প্রথম বাজীতে জিতলো ভার্দের একটা ঘোড়া।

এইবার সুরু হ'লো দ্বিতীয় বাজীর তোড়জোর। এই বাজীটাই ছিল সেদিনের সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক দৌড়।

নির্দিষ্ট ঘোড়াগুলোকে লাইনবন্দী করে দাঁড় করানো হ'লো। সবার ডাইনে দাঁড়ালো 'নানা'।

হেক্তর ইয়ারকি করে বললো—নানার পিঠে কে চাপবে আজ?

নানাও হাসতে হাসতে উত্তর দিল—নানার পিঠে চাপার সৌভাগ্য পেয়েছে আজ জকি প্রাইস।

প্রাইস ছিল লণ্ডনের নাম-করা জকিদের অন্যতম। অনেক দেশে অনেকরকম ঘোড়ার সওয়ার তাকে হ'তে হয়েছে—বাজীও মেরেছে অনেক।

'নানা'র উপরে খুব বেশি লোক বাজী না ধরলেও রেসাচার্য ট্রিকন কিন্তু মোটা টাকা ধরে বসলো নানা'র উপরেই। ট্রিকন 'নানা'র চালচলন দেখে ধারণা করলো যে, হয় তো 'আপসেট' মারবে সে।

দৌড় আরম্ভ হ'লো।

লুসিগ্নান আর স্পিরিট সমানে আগে আগে চলেছে। তাদের ঠিক পেছনেই 'নানা'। মাঠের মাঝামাঝি এসে হঠাৎ 'নানা' এগিয়ে চ'লো। জনতা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো 'নানা'র সাফল্যে। বিকট রবে চীৎকার স্বরু হ'য়ে গেল—বাহবা নানা! সাবাস 'নানা'!…'নানা'!…'নানা' !!…'নানা' !!!…

চারদিক থেকে 'নানা' 'নানা' রবে চীৎকার শুনে নানা ভুলে গেল স্থান-কাল-পাত্র। সেও উত্তেজিত হয়ে গাড়ীর উপরে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে আরম্ভ করলো—এগিয়ে যাও 'নানা'—এগিয়ে যাও আমার নাম রাখো, আজ তোমাকে জিততেই হবে– 'নানা'! 'নানা' !! আরও জোরে—আরও—

'নানা'ই বাজী মারলো।

জনতা তখনও চীৎকার করছে—'নানা'! 'নানা' !!…'নানা' !!!…

নানার মনে হ'লো অগণিত জনতা চীৎকার করে যেন তাকেই আজ অভিনন্দন জানাচ্ছে।

এই সময় লা-বোর্দেত্ হঠাৎ দু'হাজার লুই এনে নানার হাতে দিয়ে বললো—এই নাও!

—একি! আমি তো 'নানা'র উপরে বাজী ধরতে বলিনি!

—তুমি না বললেও আমি ধরেছিলাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, 'নানা'ই আজ বাজী মারবে।

'নানা'র এইভাবে বাজী মারবার ফলে কাউণ্ট ভাঁদেভো একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসলো। সে তার সর্বস্ব বাজী ধরে বসেছিল তার নিজের ঘোড়া লুসিগ্নানের উপরে। ভবিষ্যতের ভয়াবহ অবস্থা চিন্তা করে সে ধীরে ধীরে মাঠ থেকে বেরিয়ে গেল। আস্তে আস্তে সে তার আস্তাবলের কাছে গেল। আস্তাবলে ঢু'ক সাবধানে দরজা-জানালা বন্ধ করে পকেট থেকে দেশলাই বের করে হাতে নিয়ে, কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে, চারদিকটা ভাল করে দেখে নিল একবার।

তারপর একটা কাঠি জ্বেলে নিজের হাতে আগুন ধরিয়ে দিল সে আস্তাবলে।

দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আস্তাবলটা।

ঘোড়াগুলোর সঙ্গে কাউণ্ট ভাঁদেভোও পুড়ে মারা গেল আস্তাবলে আবদ্ধ অবস্থায়।

ঐ রাত্রেই 'মেবিল'এ এক বিরাট অভিনন্দন দেওয়া হ'লো নানাকে। প্যারীর অভিজাত মহলের প্রায় সবাই উপাস্থত হয়েছিল সেই অভিনন্দন-সভায়।

মহিলা সমাবেশও হয়েছিল অনেক। প্যারীর সুন্দরীর দল তাদের উন্নত ও উন্মুক্তপ্রায় বক্ষ-শোভা দেখিয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

নানা আসতেই কলগুঞ্জন ঐকরোলে পরিবর্তিত হ'য়ে গেল। সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো—সুস্বাগত নানা!

একজন লোক হঠাৎ ছুটে গিয়ে নানাকে একেবারে কাঁধে তুলে নাচতে সুরু করলো।

সমাগত ভদ্রমহিলা আর ভদ্রমহোদয়বৃন্দ আনন্দের আতিশয্যে বেসামাল হ'য়ে এমন সব কাণ্ডকারখানা সুরু করে দিলেন, যার বর্ণনা না করাই ভালো।

চেঁচিয়ে, বাগানের ফুল ছিঁড়ে, গাছ উপড়ে, এমনই সম্বর্ধনা জানানো হ'লো নানাকে, যেরকম প্রলয়ঙ্কর সম্বর্ধনা প্যারীতে আর কাউকে কোনদিন জানানো হয়েছে কিনা সন্দেহ।

চোদ্দ

কিছুদিন থেকে নানা যেন একটু মনমরা হ'য়ে পড়েছিল। কেন যেন তার মনে হচ্ছিল যে, সে যা করছে, তার ফলে তাকে নরকে যেতে হবে।

নরক! কেমন জায়গা সেটা?

সেখানে কি যমদূতরা তাকে রেহাই দেবে?

নিশ্চয়ই উত্তপ্ত তেলের কড়াতে ডুবিয়ে মারবে তাকে!

এই সব চিন্তা এসে আচ্ছন্ন করে ফেললো নানার মন।

মৃত্যুভয়ে এবং মৃত্যু-পরবর্তী নরকের ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলো সে।

এইরকম যখন তার মনের অবস্থা, সেই সময় একদিন কাউণ্ট মাফাত্‌কে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো নানা—আচ্ছা বলো তো কাউণ্ট! সত্যিই কি স্বর্গ আর নরক বলে কিছু অছে?

কাউণ্ট সেদিন এসেছিলেন নানার সঙ্গে একটা ফয়সালা করে ফেলতে। নানালোকের মুখে নানাকথা শুনে নানার উপর তিনি বেশ কিছুটা বিরক্তি নিয়েই এসেছিলেন সেদিন, কিন্তু হঠাৎ নানার মুখে স্বর্গ-নরকের কথা শুনে তিনি যেন কেমন হয়ে গেলেন। নানার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে, তার মুখ-চোখ যেন বসে গেছে। তাকে দেখলে মনে হয়, যেন সে অসুখে ভুগছে।

কাউণ্টের সব রাগ জল হ'য়ে গেল।

নানাকে সান্ত্বনা দেবার আশায় তিনি বললেন—কি হয়েছে তোমার? শরীর ভাল আছে তো? কোন অসুখ-বিসুখ করেনি তো?

নানা বললো—না, অসুখ করেনি, কিন্তু তুমি আর আসো না কেন, বলো তো? আমার এখন সব সময়ই মনে হয় যে, আমাকে নরকে যেতে হবে।

কাউণ্ট বললেন—কেন অযথা নর কর কথা ভেবে মন খারাপ করছো, নানা? পরলোক বা নরক থাকতেও পারে, আবার না-ও থাকতে পারে

তা ছাড়া, তুমি এমন কি করেছো, যাতে তোমার ধারণা হচ্ছে যে, তুমি নরকে যাবে ?

—যাবো না ? বলছো তুমি একথা ? সত্যি কাউন্ট, আমাকে তুমি বাঁচালে এই কথা বলে।

এই কথা বলেই নানা হঠাৎ দু'হাত দিয়ে কাউন্টকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললো। কাঁদতে কাঁদতেই সে বললো—না না, আমি মরতে পারবো না। নরক—উঃ, সে কী ভয়ানক !

কাউন্ট সস্নেহে নানার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন—ছিঃ! ওরকম ছেলেমানুষি কোরো না। আমি তো জানি যে, তুমি এমন কোন পাপ কাজ করোনি, যাতে তোমাকে নরকে যেতে হবে।

—তুমি বলছো এ কথা ? আমি যা করছি, সে সব পাপ নয় ? এই যে তোমাদের সবার কাছে প্রেমের অভিনয় করে আর দেহের ফাঁদ পেতে তোমাদের টাকা নিচ্ছি—এ সব কি পাপ নয় ?

—না নানা, এ তোমার পাপ নয়। তুমিও যেমন নিচ্ছো, সেইরকম আমরাও তো দিচ্ছি। আমরা যদি ইচ্ছা করে না দিই, তা হলে তুমি তো জোর করে নাও না ?

কাউন্টের এই কথায় মনে কিছুটা বল পেলো নানা। কাউন্টকে ছেড়ে দিয়ে খাটের উপরে বসে পড়লো সে।

খাটে বসে হঠাৎ আয়নার দিকে দৃষ্টি পড়লো তার।

আয়নায় নিজের চেহারা দেখে ভয়ে আঁতকে উঠলো সে।

হঠাৎ সে ছুটে গেল আয়নাটার সামনে।

নিজের মুখখানাকে যথাসম্ভব বিকৃত করে আঙুল দিয়ে গাল টিপে ধরলো সে। আয়নায় তার সেই বিকৃত মুখের প্রতিচ্ছবি দেখে ঘৃণায় আর ভয়ে শিউরে উঠলো সে।

কাউণ্টের দিকে তাকিয়ে সে বললো—ঐ ছাখো কাউণ্ট, কী বিশ্রী দেখতে লাগছে আমাকে! আমি রাক্ষুসী—আমি একটা রাক্ষসী!

—তুমি কি পাগল হ'লে নাকি? কি সব যা তা বলতে আরম্ভ করেছো!

কাউণ্ট মাফাত্ নানাকে শান্ত করতে এ কথা বললেও মনে মনে তিনিও ভয় পেয়ে গেলেন।

নানার কথাবার্তা, তার মুখ বিকৃত করে দেখানো, এই সব ব্যাপারে আর এক মুহূর্ত্তও ওখানে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছিলো না তাঁর। নানার সাহচর্য যেন বিষের মত মনে হচ্ছিলো কাউণ্টের!

তাই তিনি দু'একটা সান্ত্বনার কথা বলেই সরে পড়লেন ওখান থেকে।

ডাক্তার ডাকা হ'লো নানাকে দেখতে।

ডাক্তার এসে নানাকে পরীক্ষা করে যা বললেন, সে কথাগুলো আর সবার কাছে আশ্চর্যজনক মনে হ'লেও নানা সেটা আগেই বুঝতে পেরেছিল। নানা অন্তঃসত্ত্বা!

ডাক্তার বললেন যে, এই ব্যাপারটাকে মনে মনে চেপে রাখবার চেষ্টার ফলেই নানার মানসিক অবস্থার অবনতি দেখা গেছে।

পরদিন কাউণ্ট আসতেই জো এই সুখবরটা জানিয়ে দিল তাঁকে। ক্রমে আরো অনেকে এসে জুটলো।

ওদের সুখবরটা জানাতেই মৌমাছির চাকের নীচে ধোঁয়া দেবার মত অবস্থা হ'লো।

সবাই একে একে কেটে পড়তে লাগলো। হঠাৎ সবারই জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেল একসঙ্গে। প্রত্যেকেই ভাবলো যে, নানা যদি তাকেই তার হবুছেলের বাবা বলে দাবী করে বসে, তা হলেই বিপদ!

বারবনিতার বাড়ীতে মজা লুটতে আসা যায়, কিন্তু তা বলে তো আর তার ছেলের বাবা হওয়া চলে না!

এর দু'দিন পরে কাউণ্ট যখন নানার ঘরে এলেন, নানা তখন খাটে শুয়ে। মাথার যন্ত্রণায় বালিশ থেকে মাথা তুলতেও কষ্ট হচ্ছিলো তার।

কাউণ্টকে দেখে সে বললো—এসো কাউণ্ট! কাল রাত্রে আমার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে—এ আশাই আমার ছিল না। পেটেরটা গেছে—সে খবরটা শুনেছো বোধ হয়? কালই হয়েছে ব্যাপারটা।

নানার জারজ ছেলের বাপ হ'তে হবে না, এই কথা শুনে কাউণ্ট যেন বেঁচে গেলেন। কিছুক্ষণ কোন কথাই বের হ'লো না তাঁর মুখ দিয়ে।

কাউণ্টের ভাববৈকল্য লক্ষ্য করে নানা বললো—অতো ভাবছো কি, বলো তো? এসো, আমার পাশটিতে একবার বসো দেখি।

যন্ত্রচালিতের মত কাউণ্ট মাফাত্ নানার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসে পড়লেন।

নানা বললো—তোমার কি হয়েছে, বলো তো? তোমারও কি কোন অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি?

—না।

—তবে? অমন চুপ করে গেলে কেন তুমি? আমাকে কিছু বলতে চাও কি?

—না।

কিন্তু কাউণ্ট মুখে 'না' বললেও নানা ঠিকই বুঝে নিলো যে, তিনি মনের ভাব চেপে রাখতে চেষ্টা করছেন। নানার ধারণা হ'লো যে, কাউণ্ট বোধ হয় তাঁর স্ত্রীর গোপন অভিসারের খবর জানতে পেরেছেন। সে তাই বলে বসলো—তুমি কিছু না বললেও আমি কিন্তু বুঝে নিয়েছি তোমার মনের কথা।

কাউণ্ট নানার কথায় চমকে উঠে বললেন—কি বুঝতে পেরেছো তুমি?

নানা কাউণ্টের প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়ে বললো—হাতে-নাতে ধরে ফেলেছিলে নাকি?

—না। তবে সে একরকম হাতে-নাতে ধরবারই সামিল।

—কি রকম?

—রকম যা-ই হোক, ঐ বদমাস সম্পাদকটাকে আমি খুন করবো। চাবকে ওর পিঠের চামড়া তুলে নেবো আমি, এ তুমি দেখে নিও।

নানা বললো—না না, ওসব কিছু করতে যেও না যেন। ওসব করতে গেলে তোমার নিজেরই ক্ষতি হবে বেশি। খবরের কাগজগুলো সপ্তাহের পর সপ্তাহ তোমার ঘরের এই কেলেঙ্কারিকে ফলাও করে ছাপতে থাকবে, যার ফলে সমাজে তোমার মুখ-দেখানোই দায় হয়ে উঠবে।

—তবে আমি কি করবো বলতে পারো?

—করবে আবার কি? কাউণ্টেসের সঙ্গে মিটমাট করে ফ্যালো। তুমি যদি কাউণ্টেসকে ভালবাসো, তাঁকে যদি ঠিক আগের মত আদর-যত্ন করো, তা হলে দেখবে, তিনিও তোমাকে ভালবাসছেন।

ভূতের মুখে রামনামের মত হ'লেও নানার মুখে হিতোপদেশ শুনে কাউণ্ট কিন্তু একেবারেই গলে গেলেন। একটু আগেও তাঁর মনের ভিতরে যে গ্লানি জমে উঠেছিল, নানার কথায় সেই গ্লানি যেন কর্পূরের মতই উবে গেল। তিনি তখন নানার মুখের কাছে মুখ নিয়ে তার ঠোঁটে একটা চুমো দিয়ে বললেন—তুমি ঠিকই বলেছো নানা, মিটমাট আমাকে করতেই হবে।

নানা বললো—তা ছাড়া, টাকাও তো চাই। তোমার অবস্থার কথা সবই তো আমাকে বলেছো তুমি। এ অবস্থায় কাউণ্টেসের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করলে সবদিক দিয়েই সর্বনাশ।

কথাটা ঠিকই বলেছিল নানা।

কাউণ্টের তখন নিজের সম্পত্তি বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। একটিমাত্র বড় জমিদারি যা অবশিষ্ট ছিল, সেটিকে বিক্রি করবার কোন অধিকার ছিল না কাউণ্টের। ঐ জমিদারিটি তাঁর শ্বশুরের দেওয়া। দানপত্রের সর্ত

অনুসারে ওঁরা স্বামীস্ত্রী একত্র সই না দিলে ওটাকে বিক্রি করবার উপায় ছিল না।

এদিকে কাউণ্টেসের অবস্থাও তখন খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। নূতন নূতন উড়তে শিখে বেশ কিছুটা বেহিসাবী হয়ে পড়েছিলেন তিনি। স্বামীর উপরে রাগ করে তিনি যা খুশী তা-ই করে বেড়াচ্ছিলেন। বস্তুতঃ সম্পাদকের সঙ্গে তাঁর অবৈধ প্রেমের মুলেও ছিল স্বামীর উপরে ঈর্যা। কাউণ্ট যে তাঁকে ফেলে দিবারাত্র নানার বাড়ীতে পড়ে থাকবেন, এটা তাঁর সহ্যের বাইরে ছিল।

চতুর সম্পাদক কাউণ্টেসের এই মানসিক অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিতে সুরু করেছিল।

কাউণ্টকে চুপ করে থাকতে দেখে নানা আবার বললো—ভালো কথা! এস্টেলের বিয়ের আর দেরি কত ?

—আর পাঁচ দিন। সামনের মঙ্গলবার ওদের বিয়ে।

—ভালো। তোমাদের যাতে ভালো হয়, তাই-ই আমি চাই। আমার ইচ্ছা যে, তুমি আজই কাউণ্টেসের সঙ্গে মিটমাট করে ফ্যালো! আর তা ছাড়া, আমার জন্য তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে একটা ছাড়াছাড়ি হোক, এ আমি কিছুতেই হ'তে দেবো না।

নানার এই কথায় কাউণ্ট একেবারেই গলে গেলেন। তিনি তার বুকের উপরে ঝুঁকে পড়ে কপালে একটা চুমো দিয়ে বললেন—তুমি এতো ভালো, নানা ?

পনেরো

শ্রীমান ড্যাগনেটের সঙ্গে কুমারী এস্টেলের শুভ বিবাহ।

কাউণ্ট মাফাতের মেয়ের বিয়ে, সুতরাং আয়োজনটা যে বিরাট রকমেরই হয়েছিল, সেকথা না বললেও বোঝা যায়। প্যারীর কেউ-কেটারা সবাই এসেছিলেন কাউণ্ট মাফাতের নিমন্ত্রণে। মার্কুইস্, কাউণ্ট, পদস্থ রাজপুরুষ, সাংবাদিক, শিল্পী, গুণী, জ্ঞানী, মাননীয় ও মাননীয়ার দলে ভরতি হয়ে গেলে মাফাত্-প্রাসাদ।

মহিলাদের শ্রীঅঙ্গে হীরে-জহরতের ছড়াছড়ি। ঝলমলে আলোয় ঝক্মক্ করছে সেই সব হীরে, চুনী, পান্না, আর পদ্মরাগ মণিগুলি।

'ফিগারো'-সম্পাদককেও দেখতে পাওয়া গেল নিমন্ত্রিতদের মধ্যে। সে ছাড়া আরও যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে ষ্টিনার, হেক্তর, জর্জ, এবং ফিলিপিও ছিল। মাফাত্-প্রাসাদটিকে একেবারে নূতনের মত করে মেরামত করা হয়েছিল। কোথাও একটু ভাঙা বা আস্তর-চটা পর্যন্ত ছিল না। সর্বত্রই ঝক্ঝক্-তক্তক্ করছে। নিমন্ত্রিতরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছিল।

বর্ষীয়সী মহলে আলোচনা চলছিল :

—যা-ই বলো, কাউন্টেসের পছন্দ আছে! কী চমৎকার করে বাড়ীখানার ভোল ফিরিয়েছে, দ্যাখো তো?

—তা আর হবে না? টাকা থাকলে সবই হয়।

—না, সব সময় টাকা থাকলেই হয় না সব কিছু। টাকা তো অনেকেরই আছে, কিন্তু সবাই কি এইরকম পরিপাটি করে সাজাতে পারে?

—ফার্নিচারগুলো দেখেছো? যেন এইমাত্র তৈরি হয়ে এসেছে!

—তোমরা তা হলে বলছো যে, এসবই কাউন্টেস করেছেন?

—তা নয় তো কি? কাউণ্ট কি এখন বাড়ীর কোন খোঁজ-খবর রাখেন নাকি? তিনি তো দিনরাত নানার বাড়ীতেই···

—চুপ চুপ! কেউ শুনতে পেলে কি ভাববে?

—শুনুক না! একথা আজ কে না জানে?

ওদিকে আবার অপেক্ষাকৃত কম বয়সের মেয়ে-মহলে এইরকম আলোচনা চলছিল:

—কাউণ্টেসের সম্বন্ধে একটা কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যাচ্ছে।

—কি কথা? সেই সম্পাদকের সঙ্গে ওঁর ঢলাঢলির কথা তো?

—হ্যাঁ। কাউণ্টেস নাকি মাঝে মাঝে রাত কাটাতেও স্থরু করেছেন ওর ঘরে।

চাপা হাসি হেসে আর একজন টিপ্পনী কাটলো—তা এতে আর দোষের কি আছে? কাউণ্ট থাকবেন নানার বাড়ীতে, তাই কাউণ্টেসও রাত কাটাচ্ছেন সম্পাদক মশায়ের ঘরে।

আর একজন বললো—যাই বলো, সম্পাদকটার কিন্তু বরাত ভালো। কাউণ্টেসের সঙ্গে প্রেম করে আর টাকা-পয়সার ভাবনা ভাবতে হচ্ছে না আজকাল ওকে।

—তার মানে?

—মানে প্রেমিকাই পয়সা যোগাচ্ছেন প্রেমিককে।

—তাই নাকি? এতদূর!

অন্যত্র পুরুষ মহলে:

—জামাই-বাবাজীকে আশীর্বাদ করতে কনের সৎমা এলো না যে?

—কে? নানা? তার কি আসবার উপায় আছে নাকি?

—কেন?

—কারণ, কাউণ্টের ঐ জামাই-বাবাজীও যে তার একজন পিয়ারের লোক।

—যা বলেছো ভাই! মেয়েমানুষটা সত্যিই খেল দেখিয়ে ছাড়লো! কবে হয়তো শুনতে পাবো যে, কোন বাড়ীতে বাপ-ব্যাটাতে মারামারি লেগে গেছে নানাকে উপলক্ষ্য করে। ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগাভাগি তো দেখাই যাচ্ছে। এমন কি জামাইয়ের অসাক্ষাতে কোন এক শ্বশুরও নাকি মাঝে মাঝে ঢুঁ মারছেন ওখানে।

—কে বলো তো?

—কে আবার! তোমাদের মহামাননীয় মার্কুইস-দ্য-কুয়ার্দ!

—যাও, ওটা তোমার বানানো কথা। এ কখনও হ'তে পারে?

—হ'তে পারে, কি পারে না—তা জানি না, তবে সেদিন আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম বুড়ো মার্কুইসকে নানার বাড়ী থেকে গভীর রাত্রিতে বেরিয়ে আসতে।

—হয় তো কোন কাজ ছিল!

—কাজ? তুমি হাসালে দেখছি। নানার বাড়ীতে রাত একটার সময় কি এমন জরুরী কাজ থাকতে পারে মার্কুইসের—মাত্র একটা ছাড়া?

এই সময় হঠাৎ ফুচেরির দিকে দৃষ্টি পড়ায় আর একজন হঠাৎ বলে উঠলো—আরে আরে! সম্পাদক মশাই দেখছি এত লোকের মাঝখানেও প্রেম করতে ছাড়ছে না—ঐ ছ্যাখো কেমন ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে আছে কাউণ্টেসের দিকে।

আর একজন বললো—তা না থেকে উপায় কি? কাউণ্টেসের দেয়া টাকা দিয়েই তো আজকাল নানার ঘরে ফূরতি চলছে ওর।

—তাই নাকি?

—নয় তো কি? নানার বাড়ীতে সবজি-বাগান করে দেবার ভার যে ওরই উপর পড়েছে।

এইভাবে প্রত্যেক জায়গায় এবং প্রত্যেক দলের মুখেই ঘুরে ফিরে কেবল নানার প্রসঙ্গ চলছিলো অতিথিদের ভিতরে।

এই সময় সবাইকে সচকিত করে অর্কেস্ট্রায় এমন একটি গানের সুর বেজে উঠলো, যে গানটি প্যারীর প্রত্যেক লোকেরই বহুবার শোনা হয়ে গেছে। সুরটা হচ্ছে ভ্যারাইটি থিয়েটারে অভিনীত 'ব্লণ্ডি ভেনাস' নাটকের একটি গানের সুর। বলা বাহুল্য, ঐ গানটি নানাই গাইতো।

বল-রুমে নাচ সুরু হয়ে গেল।

পানোন্মত্ত নরনারী একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে নাচ সুরু করে দিল।

নাচের ঘরে এত বেশি নরনারীর সমাবেশ হয়েছিল যে, ঘরের আবহাওয়া অচিরেই উত্তপ্ত হয়ে উঠলো।

নাচতে নাচতে মাদাম্ সাঁতারু বললো—এর চাইতে আগের দিনই ছিল ভালো।

মাদামের জুটি বললো—কেন ?

—নয়তো কি! আগের দিনে বিয়ে-শাদী হ'লে কেবলমাত্র বর-কনের কয়েকজন আত্মীয় আত্মীয়াকেই নিমন্ত্রণ করা হ'তো। কিন্তু এখন এমন হয়েছে যে. নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা বা আরামের ব্যবস্থা যা-ই হোক, সংখ্যায় বেশি হ'লেই হ'লো।

আর একজন মহিলা নাচতে নাচতে বললেন—তা যা বলেছেন! এখন তো নিমন্ত্রণ করার মানেই হচ্ছে বড়মানুষি দেখানো। এই যে এত লোক আজ এখানে এসেছে, সত্যি কথা বলতে কি, আমি এদের মধ্যে পঞ্চাশ জনের বেশি লোককে চিনিও না।

এমনি ভাবেই বিরাট জাঁক-জমকের মধ্যে এস্টেলের বিয়ের প্রীতিভোজ শেষ হ'লো।

* * * *

ভোজের পরের দিন।

কাউণ্ট মাফাত্ আস্তে আস্তে কাউণ্টেসের ঘরে প্রবেশ করলেন। দুই বৎসরের মধ্যে এই প্রথম কাউণ্ট মাফাত্ তাঁর স্ত্রীর ঘরে এলেন। কাউণ্টকে

ঘরে ঢুকতে দেখে কাউণ্টেস রীতিমত বিব্রত হয়ে উঠলেন। তাঁর ধারণা হ'লো যে, কাউণ্ট বুঝি ফুচেরির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার ব্যাপার নিয়েই কিছু বলতে এসেছেন। তাঁর বুকের ভিতরে ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো।

কাউণ্ট কিন্তু তাঁকে ওসব কথা কিছুই বললেন না। তিনি প্রথমেই প্রস্তাব করে বসলেন মিটমাট করে নেবার। "যা হবার হয়ে গেছে"—এই ধরণের একটা কিছু বলে কাউণ্ট একেবারে সরাসরি আর্থিক অনটনের কথা পেড়ে বসলেন।

টাকা তখন কাউণ্টেসেরও দরকার। তাঁর হাতও খালি হয়ে এসেছিল। তিনি তাই বললেন—কি করা যায়, বলো তো?

কাউণ্ট বললেন—আমি ভাবছি যে, নিস্ বর্দেস্-এর জমিদারিটা বিক্রি করলে কেমন হয়?

কাউণ্টেস সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন এই প্রস্তাবে। কথা হ'লো যে, জমিদারি-বিক্রির টাকাটা ওঁরা স্বামী স্ত্রীতে সমানভাবে ভাগ করে নেবেন।

ঐ দিনই বিকালে কাউণ্ট মাফাতের জামাই মঁসিয়ে ড্যাগনেট নানার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'লো। নানা তখন ঘুমোচ্ছিল। জো এসে তাকে ডেকে তুলে দিয়ে ড্যাগনেটের আগমনবার্তা জানাতেই নানা বললো—পাঠিয়ে দে ওকে এই ঘরে।

একটু পরেই ড্যাগনেট এসে বললো—আমি তোমার কাছে এলাম, নানা।

নানা বললো—সে কি হে! তোমার না আজ বিয়ে?

নানা তার বিয়ের কথা তুলতে সে একটু আমতা-আমতা করে বললো—হ্যাঁ, মানে তোমারই অনুগ্রহে আমার এই বিয়ে, নানা। সেই জন্যই তো তোমার কাছে এলাম আমি। আমি আজ তোমার আশীর্বাদ নিতে এসেছি।

নানা হেসে বললো—বেশ বেশ! বিয়ের মন্ত্র পড়বার সময়ও দেখছি আমাকে ভুলতে পারোনি তুমি।

এর পর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে নানা বললো—কিন্তু এ তো ভালো কথা নয়, ড্যাগনেট! তুমি আজ এস্টেলকে বিয়ে করতে যাচ্ছো। এর পর আমার সঙ্গে আর তোমার দেখা না হওয়াই ভালো। তুমি আর কোন দিন আমার কাছ এসো না। এই দেখাই যেন আমাদের শেষ দেখা হয়।

এর পর ঘণ্টা দুই ওখানে কাটিয়ে ড্যাগনেট যখন নানার বাড়ী থেকে বের হ'লো, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

ঐ রাত্রেই নবপরিণীতা পত্নী এস্টেলকে নিয়ে হানিমুন করতে বেরিয়ে গেল ড্যাগনেট।

ষোলো

সেদিন 'ফ্যান্সি-ড্রেস-বল'এ যাবার কথা ছিল নানার। ঠিক ছিল যে, কাউণ্ট মাফাত্‌ এসে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন নানাকে। নানা জানতো যে, কাউণ্ট রাত ন'টার আগে কিছুতেই আসবেন না, তাই সে জর্জকে নিয়ে একটু প্রেমের খেলা খেলছিল। জর্জ বেচারার অবস্থা এমনই সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল যে, দিনে একটিবার অন্ততঃ নানাকে না দেখলে সে থাকতে পারতো না। ও এলে নানাও যে অখুশী হ'তো, তা নয়। কিন্তু পাছে কাউণ্ট কিছু মনে করেন, এই ভয়ে জর্জকে সে যখন তখন আসতে নিষেধ করে দিয়েছিল। জর্জ একটি কানাকড়িও দিতে পারতো না নানাকে। তা ছাড়া, সে দেবেই বা কোথা থেকে? মাঝে মাঝে মায়ের বাক্স থেকে দু'দশ ফ্রাঙ্ক যা সরাতো সে, তাতে তার নিজের পকেট-খরচই কুলোতো না। এইসব বুঝে নানাও কোনদিন তাকে টাকাপয়সার কথা বলতো না।

সেদিন জর্জ হঠাৎ এসে পড়েছিল। সে আসতেই নানা বললো—কি ব্যাপার? তোমাকে না যখন তখন আসতে নিষেধ করে দিয়েছি আমি!

—কিন্তু আমি যে তোমাকে না দেখে থাকতে পারি না, নানা?

—তা তো পারো না, বুঝলাম। কিন্তু এদিকে যে তুমি এসেছো শুনলে কাউণ্ট বিরক্ত হ'ন, তা কি তুমি জানো না?

—তা জানি, কিন্তু আমি জানি যে, আজ কাউণ্টের আসতে অনেক দেরি।

নানা হেসে বললো—তাই বুঝি তুমি হ্যাংলার মত ছুটে এসেছো?

জর্জ বললো—সত্যি নানা, তোমাকে না দেখতে পেলে আমি মরে যাবো।

—তাই নাকি! সত্যি মরে যাবে?

—নিশ্চয়, তোমাকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাবো। আচ্ছা নানা…

—কি বলছো?

—একটু কাছে সরে এসো না!

—এই তো এসেছি, কি বলবে বলো?

নানা কাছে সরে আসতেই জর্জ তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তার গালে একটি চুমো দিয়ে বললো—নানা!

—কি?

—তুমি আমাকে বিয়ে করো না?

—বিয়ে! তোমাকে?

এই বলেই খিল খিল করে হেসে উঠলো নানা।

হাসতে হাসতে নানা একেবারে জর্জের গায়ের উপরে গড়িয়ে পড়লো। আর ঠিক সেই সময় কাউন্ট এসে একেবারে ওদের সামনে দাঁড়ালেন।

রাজপ্রাসাদ থেকে তাঁর জরুরী ডাক পড়ায় ঐ রাত্রে নানাকে নিয়ে 'ফ্যান্সি-ড্রেস-বল'এ যেতে পারবেন না,—এই কথাটি বলতেই তিনি অসময়ে এসে পড়েছিলেন।

তখন সন্ধ্যা উত্‌রে গিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘরে আলো জ্বালা ছিল না। আলো জ্বালতে কয়েকবার এসেছিল জো, কিন্তু নানাকে জর্জের সঙ্গে মশগুল অবস্থায় দেখে সে আর ঘরে ঢোকেনি। এমন কি সিঁড়িতেও আলো জ্বেলে দেয়নি সে।

কাউন্ট এসে ওদের সামনে দাঁড়াতেই নানা ধড়মড় করে দাঁড়িয়ে উঠে তাড়াতাড়ি কাউন্টের হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। জর্জ বেচারার অবস্থা তখন রীতিমত কাহিল। সে যে এইভাবে হাতে-নাতে ধরা পড়বে, একথা সে ভাবতেও পারেনি। তাই নানা যখন কাউন্টকে নিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল, সে-ও সেই অবসরে একেবারে দে-ছুট।

নানার তখন নিজের উপরেই রাগ হতে লাগলো নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য। অন্ধকারে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে কোনরকমে আলোটি জ্বেলে দিল নানা।

আলো জ্বালা হয়ে গেলে সে নানারকম অসংলগ্ন কথা বলে কাউণ্টকে ভোলাতে চেষ্টা করলো। সে বললো—তুমি তো সবই বোঝো! ওদের আমি আসতে বলি না, তবু আসে। কিন্তু কেউ যদি বাড়ীতে আসে, তা হ'লে তাকে কি বলে দূর করে দিই, তা তুমিই বলো না?

কাউণ্ট বেশ একটু উষ্ণ হয়েই জবাব দিলেন—কিন্তু তুমি ওর সঙ্গে যেভাবে ঢলাঢলি করছিলে, তা দেখে তা যে কেউ···

নানা হঠাৎ ক্ষেপে উঠলো এই কথায়। সে চীৎকার করে বললো—ঢলাঢলি কি দেখলে? তুমি জানো যে, ও আমাকে ওর নিজের বড়দির মত মনে করে, তা সত্ত্বেও এ সব কথা তুমি মনে আনলে কি করে? ছিঃ! তোমার মনটা যে এত নীচু, তা আমি ভাবতেও পারি নি।

কাউণ্ট বুঝলেন সবই, কিন্তু কিছু বলতে সাহস পেলেন না। তাঁর ভয় হ'লো যে, নানা হয়তো আবার তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে। তিনি তখন মুখে কাষ্ঠ-হাসি হেসে বলতে চেষ্টা করলেন—না না, আমি ঠিক তা বলছি না, মানে—আমি···মানে···বোঝোই তো···

নানা বললো—বেশ! আজ আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যে, ওকে আর এ বাড়ীতে আসতে দেবো না। তা হ'লেই হবে তো?

সেদিনের মত কাউণ্টকে এইভাবে বোকা বুঝিয়ে বিদেয় করলেও আবার একদিন তিনি ধরে ফেললেন নানাকে। এবারের নাগর আবার আর একজন। কাউণ্ট তখন হাল ছেড়ে দিলেন ও ব্যাপারে। তিনি বুঝে নিলেন যে, একনিষ্ঠ প্রেম নানার কাছ থেকে আশা করা বৃথা। কিন্তু সব বুঝেও তিনি চুপ করে থাকলেন। কারণ, নানাকে ছাড়া তাঁর চলবে না। নানা যা-ই করুক, তবুও তাকে তাঁর চাই!

তিনি তখন সুরু করলেন অর্থবৃষ্টি। অর্থ দিয়েই বশীভূত করতে চাইলেন তিনি নানাকে। এইভাবে কাউণ্টের কাছ থেকে অপরিমিত অর্থ পেয়ে

নানার ভোগবিলাসবাসনাও যেন উদ্দাম হয়ে উঠলো। সে তখন দু'হাতে টাকা ওড়াতে সুরু করলো।

এই সময়টাই ছিল নানার জীবনে সবচেয়ে সুখের। নানার চালচলন, নানার বিলাসিতা এবং সর্বোপরি অর্থের উপর নানার তাচ্ছিল্যভাব দেখে সারা প্যারীর বিলাসী সম্প্রদায় একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

মাত্র একটি রাত্রি নানাকে শয্যাসঙ্গিনীরূপে পাবার জন্যে দশ হাজার ফ্রাঙ্ক খরচ করবার মত লোকেরও অভাব ছিল না তখন।

এই সময়টায় নানার বাড়ীতে যে রকম খরচ হ'তো, অনেক রাজা-জমিদারের বাড়ীতেও সে রকম খরচ হ'তো না। একমাত্র খাবার খরচই হতো মাসে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্কের বেশি। নানার বাড়ীর রান্নাঘরে রীতিমত লুটতরাজ চলছিল তখন। পাচকরা যাকে খুশি এবং যত খুশি বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করে তো খাওয়াতোই, এমন কি তাদের বাড়ীতেও পাঠাতো রান্না-করা খাবার।

পরিচারিকা জুলিয়ান তো টাকা প্রতি আট আনা হিসাবে কমিশন আদায় করতে সুরু করে দিল সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে। সাপ্লায়াররাও সুযোগ বুঝে এক টাকার মাল পাঁচ টাকা দরে বিল করতে লাগলো। সময় সময় আবার মাল সাপ্লাই না করেই বিল পাঠাতে লাগলো তারা।

এই পাইকারী লুণ্ঠনের ব্যাপারে নানার পিয়ারের পরিচারিকা জো-ই ছিল সবার উপরে। সে নিজে তো মারতোই, এমনকি অন্যান্য চাকর-বাকরের উপরেও ভাগ বসাতো সে। তাকে ভাগ না দিয়ে কোন কাজই কেউ করতে পারতো না। তবে লুটের ভাগ সে নিলেও অন্যভাবে সে অনেক সাহায্য করতো ওদের। ওদের যা কিছু দোষ-ত্রুটি, জো-ই সেগুলো ঢেকে-ঢুকে রাখতো।

জো'র টাকা লুটবার এত বেশি সুযোগ করে দিয়েছিল নানা নিজেই। নানার পোশাক-পরিচ্ছদ, গহনাপত্র কোন কিছুরই হিসাব-নিকাশ থাকতো

না। আজ যে পোশাকটা পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক খরচ করে তৈরী হলো, সেটা হয়তো মাত্র একদিন পরেই বাতিল করে দিল নানা। অনেক সময় আবার খোঁজও পাওয়া যেতো না অনেক জিনিসের। লক্ষ লক্ষ টাকা মুল্যের গহনাপত্র উধাও হয়ে যেতে লাগলো নানার দেরাজ থেকে। আজ যে জিনিস কেনা হ'লো, কালই তা কোথায় গেল, সে সম্বন্ধে খবরও রাখতো না নানা।

নানারকম জিনিস কেনা ছিল নানার একটা শখ। নানার শখ মেটাতে কত লোককে যে পথের ভিখারীর চেয়েও অধম হ'তে হয়েছিল, কেউ তার খবরও রাখতো না। কিন্তু জিনিস কেনবার শখ ষোলো আনা থাকলেও সেগুলোকে যত্ন করে রাখবার মত সময় বা নজর কিছুই ছিল না তার।

যে দোকানে নানা কোন জিনিস কিনতে ঢুকতো, সে দোকানদারের বরাত খুলে যেতো। বাজারে একটা গুজব রটে গিয়াছিল যে, নানা যে রাস্তা দিয়ে যায়, সে রাস্তায় তার পেছনে কেবলমাত্র ছেঁড়া ন্যাকড়া আর রাস্তার ধূলো ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না!

কথাটার মধ্যে সত্য ছিল অনেকখানি। যে সব জিনিস নানার ভাল লাগতো, যতই দাম হোক, সেগুলো সে সংগ্রহ করতো। দোকানদাররাও সুযোগ বুঝে এমনই দাম হেঁকে বসতো, যা নানার কাছে পর্যন্ত অসম্ভব মনে হ'তো সময় সময়। কিন্তু যত দামই হোক, সেগুলো সে কিনতোই।

জিনিস কিনে এইভাবে টাকা নষ্ট করা ছিল তার একটা খেয়াল।

শুধু যে জিনিসপত্রই কিনতো নানা, তা-ই নয়। তার খেয়ালের খেই পেতো না কেউ-ই। এমনি একটা খেয়ালের খেসারত দিতে প্রাণান্ত হচ্ছিল 'ফিগারো'-সম্পাদক ফুচেরি। নানা তার কাছে একদিন আবদার করে বলেছিল যে, তার বাড়ীর পিছন দিকটায় একটা সবজি-বাগান করে দিতে হবে সম্পাদককে। বেচারা সম্পাদককে কিন্তু নানার এই ক্ষুদ্রতম খেয়ালটির ধাক্কা সামলাতে বাঁধা দিতে হয়েছিল তার ছাপাখানাটি পর্যন্ত।

এই সময় নানার হঠাৎ একদিন খেয়াল চেপে বসলো তার বাড়ীর আসবাব-পত্রগুলো সব পাল্টাতে হবে। সেগুলো সবই নাকি পুরানো হয়ে গিয়েছিল। বাড়ীখানাকে কিভাবে সাজানো যায়, তার একটা প্ল্যানও করে ফেললো সে।

ঘরের পর্দাগুলোকে সরিয়ে ফেলে ওগুলোর জায়গায় গোলাপী রঙের মখমলের পর্দা লাগাতে হবে। পর্দাগুলোর নীচে থাকবে সোনালী ঝালর। তা ছাড়া একখানা খাটও করাতে হবে-নূতন করে। খাটের যে ডিজাইন সে মনে মনে ভেবে রেখেছিল, তা হচ্ছে—খাটখানা দেখতে অনেকটা সিংহাসনের মত হবে। খাটের বাজুতে থাকবে রূপোর কাজ-করা লতাপাতা আর মাঝে মাঝে থাকবে সোনার ফুল। তা ছাড়া খাটের চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকবে চারটি নগ্নমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি চারটির হাতেই ধরা থাকবে মশারির কোণগুলো।

যেমনি চিন্তা অমনি কাজ। সঙ্গে সঙ্গে খবর গেল প্যারীর সবচেয়ে নাম-করা কেবিনেট-মেকারের কাছে। কেবিনেট-মেকার এসে নানার ডিজাইনের ফরমাইস শুনে ছুটলো আবার এক স্বর্ণ-শিল্পীর কাছে। স্বর্ণ-শিল্পী এলে ওরা দু'জনে মিলে এষ্টিমেট করে সেই খাটের যা দাম বললো, তা শুনে সাধারণ মানুষদের পিলে চমকে যাবার কথা। ওরা সেই খাটের দাম বললো পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক।

নানা কিন্তু মোটেই পিছপা হ'লো না এই দাম শুনে। সে তখনই অর্ডার দিয়ে দিল খাট তৈরি করতে।

অর্ডার তো দেওয়া হ'লো, কিন্তু কে সেই ভাগ্যবান, যার ঘাড়ে নানার এই খাটের বোঝাটি চাপবে?

অনেক ভাবনা-চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত কাউণ্ট মাফাত্‌কেই এই খাটের বোঝা বইবার ভার দেওয়া হবে বলে স্থির করলো নানা।

পরদিন, কাউণ্ট আসতেই নানা বললো যে, একখানা খাট তৈরি করতে অর্ডার দিয়েছে সে।

কাউণ্ট বোধ হয় ভেবেছিলেন যে, একখানা খাটই তো, কি আর এমন দাম হ'তে পারে তার! তাই তিনি নিতান্ত নিস্পৃহভাবেই বলে ফেললেন—বেশ তো, অর্ডার যখন দেওয়া হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই নেওয়া হবে।

কিন্তু খাটখানার দামের কথা শুনেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবার উপক্রম হলো তাঁর। কী সর্বনাশ! একখানি খাটের দাম পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক!

কাউণ্টকে ভাবতে দেখে নানা বললো—কি গো? অতো ভাবছো কি তুমি? দামটা একটু বেশি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে তো? তা হোক, ভালো জিনিস পেতে হলে ভালো দাম দিতেই হবে।

কাউণ্ট শুধু বললেন—তা তো বটেই।

কথা হ'লো যে, খাটখানা কাউণ্ট নানাকে তার জন্মদিনে উপহার দেবেন।

এইভাবে নানাকে খুশী করতে, নানার মুখে এক টুকরো হাসি ফোটাতে কাউণ্ট মাফাত্ সর্বনাশের পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

* * *

পনেরোই অক্টোবর।

নানার জন্মদিন।

সকাল থেকেই বন্ধুবান্ধব আর স্তাবকের দল আসতে সুরু করছে।

প্রত্যেকেই যে যার সাধ্যমত উপহার নিয়ে আসছে।

ফিলিপি এলো একটা সোনালী কাজ-করা কাচের বাক্স নিয়ে।

বেচারাকে তিনশ' ফ্রাঙ্ক দাম দিতে হয়েছিল ওটার জন্য।

ফিলিপির হাতে বাক্সটি দেখেই নানা ছুটে গেল তার দিকে। তার হাত থেকে বাক্সটা একরকম কেড়ে নিয়ে নানা বললো—চমৎকার বাক্সটা তো! কত পড়লো?

—তিনশ' ফ্রাঙ্ক।

—তিনশ' ফ্রাঙ্ক! এত দাম দিয়ে এসব তুমি কেন কিনতে গেলে বলো তো? নানা জানতো যে, ফিলিপি সামান্য মাইনের চাকুরে। হয়তো এই বাক্সটি কিনতে ওকে ধার করতে হয়েছে, তাই সে বললো ওকথা।

টাকাটা কিন্তু ফিলিপি ধার করেনি। সে তখন লেফটেন্যাণ্ট থেকে ক্যাপ্টেন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল এবং ভাগ্যক্রমে সৈন্যদলের বেতন দেওয়ার ভার পড়েছিল তার উপরে। সে ঐ সরকারী টাকা ভেঙেই নানার জন্য উপহার কিনে এনেছিল। ফিলিপির উপরে নানার সেই সময় নেকনজরটা একটু বেশি ছিল। কারণ, সময় অসময় ফিলিপির কাছ থেকে সে তার হাত-খরচটা চালিয়ে নিচ্ছিলো। কিন্তু নানার এই হাত-খরচের গুঁতো সামলাতেই বেচারা ফিলিপি দশ হাজার ফ্রাঙ্কেরও বেশি সরকারী তহবিল তছরুপ করে বসেছিল।

এই বিরাট টাকা কি করে শুধবে এবং উপরওয়ালা জানতে পারলে তার কি পরিণাম হবে, এই কথা চিন্তা করে ফিলিপি মাঝে মাঝে বিমর্ষ হ'য়ে পড়তো।

কিন্তু তার এই বিমর্ষভাব একেবারেই দূর হয়ে যেতো নানা যখন তাকে আদর করে চুমো দিতো।

ফিলিপির মনে তাই আঘাত লাগলো নানার মুখে দামের কথা শুনে।

সে বললো—তিনশ' ফ্রাঙ্ক কি বলছো, দরকার হ'লে তোমার জন্য প্রাণ দিতেও পারি আমি।

নানা এইসময় বাক্সটাকে হাত থেকে টেবিলের উপরে রাখতে যাচ্ছে দেখে ফিলিপি বললো—ওটিকে খুব সাবধানে নামিও কিন্তু, ঠুনকো জিনিস, একটু আঘাত লাগলেই ভেঙে যাবে।

নানা হেসে বললো—আমাকে কি এতই আনাড়ি ভেবেছো নাকি তুমি? এই দ্যাখো না, কেমন করে রাখছি আমি।

কিন্তু নানার মুখের কথা শেষ না হতেই বাক্সটি তার হাত থেকে মেঝের উপর পড়ে গেল।

পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল বাক্সটা।

জিনিসটা এইভাবে নষ্ট হ'য়ে যাওয়ায় নানা বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। ফিলিপিকে সান্ত্বনা দিতে সে বললো—আহা! এমন সুন্দর জিনিসটি ভেঙ্গে গেল! এই কথা বলেই সে একেবারে খিল খিল করে হেসে উঠলো ছেলেমানুষের মত।

জিনিস নষ্ট করবার বা নষ্ট হয়ে যেতে দেখবার আনন্দে খুশী হ'য়ে উঠেছিল নানা, তাই তার এত হাসি!

হাসতে হাসতেই সে মন্তব্য করলো—বেশ লাগে কিন্তু জিনিসগুলো ভাঙতে দেখলে, তাই না?

ফিলিপি কিন্তু একেবারেই চুপ করে গেল।

তার মনে খুবই আঘাত লেগেছিল তার দেওয়া উপহারটা ঐভাবে নষ্ট হ'য়ে যেতে দেখে। এর উপর আবার নানাকে হাসতে দেখে সে আর সহ্য করতে পারলো না। বেশ কিছুটা আহত স্বরেই সে বললো—তুমি হাসছো নানা! কিন্তু তুমি যদি জানতে যে, কি করে আমি এই জিনিসটা···

দুঃখে আর অভিমানে তার মুখ দিয়ে আর কোন কথাই বের হ'লো না। ফিলিপির অবস্থা দেখে নানা বললো—ভেঙেছে তো কি হয়েছে! ওটা ভাঙলেও তোমার আমার ভিতরের ভালবাসা তো আর ভাঙেনি!

ফিলিপির মুখখানা তখনও আঁধার হয়ে রয়েছে দেখে নানা বললো—তোমার উপহারের জিনিসটা ভেঙেছে এই দুঃখ তো তোমার? তা হ'লে এই ছাখো, তোমার সামনেই আমি সব উপহার ভেঙে ফেলছি।

এই বলে সত্যি সত্যিই নানা উপহারের জিনিসগুলো একে একে মেঝের উপরে ছুড়ে ফেলে দিতে লাগলো। জিনিসগুলো যতই ভাঙে, নানার আনন্দও ততই বাড়ে। ধ্বংসের আনন্দে মেতে উঠলো সে।

দেখতে দেখতে সবগুলো জিনিসই ভেঙে ফেললো নানা।

ভাঙা শেষ করে আনন্দে হাততালি দিয়ে হাসতে লাগলো সে।

নানার এই ধ্বংসযজ্ঞের পাশবিক আনন্দে ফিলিপিও যোগ দিল। সেও তখন হাসতে লাগলো নানার সঙ্গে।

এইভাবে হাজার হাজার ফ্রাঙ্ক মূল্যের উপহারের জিনিসগুলো শেষ করবার পর ফিলিপির দিকে তাকিয়ে নানা বললো—আজ আমাকে গোটাদশেক লুই দিতে পারো ফিলিপি? বড় দরকার পড়েছে আমার। রুটিওলাটাকে দশ লুই দিতেই হবে কাল সকালেই।

কয়েক সেকেণ্ড আগেও যে নানা বহু সহস্র টাকা মূল্যের উপহারগুলিকে চরম অবহেলায় ভেঙ্গে তছনছ করতে পেরেছে, সে কিনা মাত্র দশটি লুই-এর জন্য হাত পাতছে ফিলিপির কাছে!

ফিলিপি কিন্তু ঘেমে উঠলো নানার এইভাবে হঠাৎ টাকা চেয়ে বসায়। কারণ, তার পকেট তখন একেবারেই 'গড়ের মাঠ'।

সে একটা ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করলো—এখনই দরকার?

—না, কাল সকালে হ'লেও চলবে।

—বেশ! কালই আমি দিয়ে যাবো টাকাটা, আজ আমার কাছে এখন কিছুই নেই। এই বলে একটুখানি চুপ করে থেকে ফিলিপি আবার বললো—তোমাকে একটা কথা বলবো, নানা?

—নিশ্চয়! একটা ছেড়ে একশ'টা বলে: না!

—নানা!

—কি?

—তুমি আমাকে বিয়ে করো?

—বিয়ে! তোমাকে?

উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়লো নানা—

—হা হা হা হা…হি হি হি হি…হো হো হো হো…বিয়ে!…মানে সতী-সাধ্বী স্ত্রী…তাই না?…হি হি হি হি!…

হাসতে হাসতে যেন গড়িয়ে পড়তে চাইলো নানা।

ফিলিপির মুখখানা কিন্তু লাল হয়ে উঠলো নানার এই পরিহাস-তরল প্রত্যাখ্যানে।

পনেরো

একটি মাত্র ছোট্ট কথাও যে সময় সময় কত বড় অনর্থ ঘটাতে পারে, তারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ ফিলিপির সেই বিয়ের প্রস্তাব।

কথাটা শুনে ফেলেছিল জর্জ।

ফিলিপির সেই প্রস্তাবটি জর্জ নিজের কানেই শুনতে পেয়েছিল। সেই কথা শোনবার পরই সে আর একমুহূর্তও নানার বাড়ীতে না দাঁড়িয়ে চলে গিয়েছিল।

নানার বাড়ী থেকে বেরিয়ে সে সোজা নিজের বাড়ীতে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। দরজা বন্ধ করেই সে বিছানার উপরে বসে পড়ে কাঁদতে স্বরু করলো।

"ফিলিপি নানাকে বিয়ে করবে! নানা তখন বৌদি হবে আমার!"—জর্জের মনে হ'লো এর চেয়ে সাংঘাতিক কথা দুনিয়ায় আর কিছু থাকতে পারে না।

সারাটা রাত জর্জ কেবল এই কথাই ভাবতে লাগলো। একবার তার মনে হ'লো—ফিলিপিকে হত্যা করলে হয় না?

কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব তার মন থেকে দূর হয়ে গেল।

অবশেষে সে মনে মনে সাব্যস্ত করলো যে, এই ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত সে করবে নানার সঙ্গে। নানাকে সে সোজা বলবে তাকে বিয়ে করতে। এতে যদি নানা রাজী না হয়, তা হলে সে আত্মহত্যা করবে। হ্যাঁ, আত্মহত্যাই করবে সে।

উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগলো তার সারা দেহ।

মাথার ভিতরটা দপ্‌ দপ্‌ করতে থাকে তার। যেন আগুন জলছে তার মাথার ভিতরে।

মাথা ঠাণ্ডা করতে ঘরের দরজা খুলে বাইরে গিয়ে রাস্তার ঠাণ্ডা হাওয়ায় অনেকক্ষণ ধরে পায়চারি করলো সে।

সে রাত্রে কিছুতেই ঘুম এলো না তার চোখে।

সারারাত জেগে থেকে ভোরের দিকে ঘুম এসেছিল তার। হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলো সে। জেগে উঠে সে দেখলো যে, বেলা তখন অনেকটা হ'য়ে গেছে। সে কারো সঙ্গে ভাল করে কথাও বললো না সেদিন। সারাটা সকাল ঘরে দরজা দিয়ে গুম হয়ে বসে থাকলো সে। তারপর দুপুরের খাওয়া-দাওয়া কোনরকমে শেষ করেই বেরিয়ে পড়লো সে।

জর্জ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই একটা ভয়ানক দুঃসংবাদ এলো মাদাম্ হিউজেনের কাছে। তিনি খবর পেলেন যে, তাঁর বড় ছেলে ফিলিপি সরকারী তহবিল তছরুপ করবার অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছে। অনেকদিন থেকেই ফিলিপি সরকারী তহবিলের টাকা আত্মসাৎ করে আসছিল। শেষ পর্যন্ত সে নাকি হিসাবের খাতাও জাল করেছিল উপরওয়ালাদের চোখে ধূলো দিতে। এই ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষ জানতে পেরেই ফিলিপিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের হেফাজতে দিয়েছেন।

মাদাম হিউজেন এই খবর পেয়ে একেবারে থ' হ'য়ে গেলেন। প্রথমেই তাঁর মনে হ'লো যে, তাঁর ছেলের এই অধঃপতনের জন্য দায়ী একমাত্র নানা। ঐ ডাইনী মেয়েমানুষটাই তাঁর ছেলের এই দশা করেছে!

মনে মনে নানাকে সহস্র অভিশাপ দিতে লাগলেন তিনি।

কিন্তু নানাকে অভিসম্পাত দিলে তো আর ফিলিপি খালাস পাবে না, সুতরাং একটা কিছু ব্যবস্থা তাঁকে করতেই হবে। তাঁর তখন মনে হ'লো যে, নানা হয়তো ফিলিপির অপরাধ সম্বন্ধে খবরাখবর জানতেও পারে। হয়তো এমন কোন খবরও তার জানা থাকতে পারে, যা নিয়ে লড়লে খালাস পেতে পারে ফিলিপি।

এই সব কথা চিন্তা করে তিনি নানার বাড়ীতে যাওয়াই মনস্থ করলেন। তিনি তখন কাউকে কিছু না বলে কোচম্যানকে গাড়ী বের করতে বললেন।

কোচম্যান গাড়ী বের করে আনলে তিনি গাড়ীতে উঠে বসে বললেন—নানার বাড়ীতে চলো!

মাদামের কথাতে কোচম্যান আশ্চর্যান্বিত হ'য়ে গেলেও কোন কথা না বলে ঘোড়ার পিঠে চাবুকের আঘাত করলো সে।

এদিকে নানার বাড়ীতে তখন পাওনাদারের দল এসে ভিড় করেছে।

ওরা সবাই এসেছে টাকা নিতে। কারণ, ঐ দিনই টাকা দেওয়া হবে বলে সবাইকে বলে দিয়েছিল নানা।

ওদের মধ্যে রুটিওয়ালা লোকটাই ছিল সবচেয়ে ছোটলোক। সে রীতিমত চেঁচাতে সুরু করে দিয়েছিল।

নানার হাতে সেদিন কিছুই ছিল না।

সে তখন বার বার রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল ফিলিপির আশায়। যদি দশটি লুই এনে দেয় ফিলিপি আজ, তা হ'লে রুটিওলাটাকে ঠাণ্ডা করা যায়।

কিন্তু কোথায় ফিলিপি?

এই রকম অবস্থায় জর্জ এসে হাজির হ'লো তার কাছে।

নানা ভাবলো যে, ফিলিপি বুঝি জর্জকে দিয়েই পাঠিয়েছে টাকা ক'টা।

তাই সে জর্জকে জিজ্ঞাসা করলো—কি হে ছোকরা! টাকা এনেছো?

—টাকা! মানে? কিসের টাকা বলো তো?

—কিসের টাকা মানে? টাকা আবার কিসের হয়? কেন, ফিলিপি কি টাকা পাঠায়নি তোমার হাত দিয়ে?

—কৈ, না তো!

—না তো, মানে? তবে কি জন্য এসেছো এখানে? রূপ দেখাতে?

—তোমার সঙ্গে আমার কিছু দরকারী কথা আছে, নানা!

—দরকারী কথা পরে হবে। এখন ট্যাঁকে কিছু থাকে তো বের করো। দেখছো না, পাওনাদারের দল মৌমাছির মত ছেঁকে ধরেছে!

—কিন্তু টাকা তো আমার কাছে নেই।

—সে আমি ভালো করেই জানি। তোমাদের দু'ভাইয়ের কারো পকেটেই টাকা থাকে না। থাকগে। এইবার মানে মানে সরে পড়ো দেখি, আমাকে এক্ষুনি বের হ'তে হবে।

—আমি তোমার কাছে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম, নানা।

—বলছি তো এখন আমার ওসব প্রেমের প্যান-প্যানানি শোনবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি বলো, কি বলতে চাও?

—তুমি কি ফিলিপিকে বিয়ে করবে?

—ছাখো জর্জ, তোমার সঙ্গে এখন আমার রসের কথা বলবার মত সময় নেই। দয়া করে পথ ছাড়ো।

—না, তোমাকে বলতেই হবে।

—কি বলতে হবে? বিয়ে করবো কি না? তোমরা কি ভাবো, বলো তো? আমি কাকে বিয়ে করবো না করবো, তা নিয়ে তোমার অতো মাথাব্যথা কেন?

—না! ফিলিপিকে তুমি কিছুতেই বিয়ে করতে পারবে না। তুমি আমার। আমাকেই বিয়ে করতে হবে তোমাকে।

জর্জের এই কথায় নানা হেসে উঠলো। হাসতে হাসতেই সে বললো—বিয়ে করতে চাওয়ার রোগটি কি তোমাদের বংশগত নাকি? কাল ফিলিপি বললো তাকে বিয়ে করতে, আজ আবার তুমি এসেছো ঐ একই প্রস্তাব নিয়ে। তোমরা কি ভাবো আমি এমনই মূর্খ যে, তোমাদের মত ঠনঠনের বাদশাদের বিয়ে করবো আমি? সরো বাপু! আমার আর সময় নেই।

—বেশ! আমাকে বিয়ে না করো না করলে, কিন্তু তোমাকে বলতে হবে যে, ফিলিপির উপরে তোমার কোন ভালবাসা নেই।

—কেন? তুমি কি আমার সোয়ামী, না ভাতকাপড় দিয়ে পুষছো? বলে একপয়সার মুরোদ নেই, তার আবার বড় বড় কথা। হ্যাঁ, কি জিজ্ঞেস করছিলে যেন? ফিলিপিকে ভালবাসি কি না? তাহলে শুনে যাও—

তোমার ভাই ফিলিপি আমার একজন পীরিতের লোক! কেমন শুনলে তো? এইবারে দয়া করে কেটে পড়ো।

নানার মুখে এই কথা শুনে জর্জের মাথার ভিতরে যেন আগুন জ্বলে উঠলো। হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে সে নানার একখানা হাত জোর করে ধরে মোচড় দিতে দিতে বললো—কি বললে? এ কথা আর একবার বললে তোমার ভাল হবে না, তা বলে দিচ্ছি।

নানা সবলে জর্জকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললো—তবে রে হারামজাদা ছোকরা! তোর এতবড় সাহস যে, আমার গায়ে হাত তুলিস তুই! বেরিয়ে যা! বেরিয়ে যা হারামজাদা আমার বাড়ী থেকে।

এই কথা বলেই নানা হন্ হন্ করে চলে যেতে লাগলো ওখান থেকে। কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে সে বললো—হ্যাঁ, আরও একটা কথা শুনে যা—যাবার আগে। কাল তোর দাদা বলে গিয়েছিল যে, সে টাকা এনে দেবে পাওনাদারদের দিতে, কিন্তু সে এলোই না! তোরা দু'জনেই হচ্ছিস ঠক—জোচ্চোর। তোদের কারোই একটা পয়সা দেবার মুরোদ হ'লো না বলেই আমাকে এখন বেরুতে হচ্ছে টাকার যোগাড় করতে। শুনলি তো? এইবার দূর হ' এখান থেকে।

এই কথাগুলো বলেই নানা বাড়ীর পেছনের দরজা দিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে গেল টাকা রোজগার করে আনতে।

নানা চলে গেলেও জর্জ কিন্তু গেল না ওখান থেকে। নানাকে এই বিপদের সময়ে আর্থিক সাহায্য করতে না পেরে তার নিজের উপরই ঘৃণা হতে লাগলো তখন।

ওদিকে পাওনাদারের দল কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একে একে বিদায় নিতে লাগলো। কিন্তু রুটিওলা লোকটা যেন নাছাড়বান্দা। সে ঠিক বসেই রইলো! টাকা সে আদায় করবেই।

এদিকে জো তখন কি একটা কাজে নানার ঘরে এসে জর্জকে বসে

থাকতে দেখে বললো—কি জর্জ সাহেব? এখনও বসে যে? তিনি তো বাড়ীতে নেই এখন!

জর্জ বললো—তা আমি জানি।

—জান তো আর বসে আছ কেন?

—নানা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাকে থাকতেই হবে। একটা দরকারী কথা আছে আমার তার সঙ্গে।

—বেশ, তা হ'লে বসুন আপনি।

এই বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জো। জো চলে যেতেই জর্জ উঠে নানার টেবিলের সামনে গিয়ে টেবিলের ঢাকা খুলে পরীক্ষা করতে লাগলো। উদ্দেশ্য—ফিলিপের কোন প্রেমপত্র-টত্র পাওয়া যায় কি না।

কিন্তু প্রেমপত্রের পরিবর্তে সে পেলো একখানা কাঁচি। ঐ কাঁচিখানা দিয়ে নানা তার নখ কাটতো, আর সময় সময় চুলের ডগাগুলো ছাঁটতো।

জর্জ কাঁচিখানা তুলে পকেটে রেখে দিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে নানার গলা শুনতে পাওয়া গেল নীচে। রুটিওয়ালাকে ধমকাচ্ছিল সে।

নানা বলছিল—এই নাও তোমার রুটির দাম! নিয়ে বিদেয় হও! আর তোমাকে এবাড়ীতে রুটি দিতে হবে না।

রুটিওয়ালা বলছিল—আহা চটেন কেন ঠাকরুণ! আমরা হলেম গিয়ে ছা-পোষা গরীব মানুষ। আপনাদের কাছ থেকে দু'টো পয়সা নিয়েই তো সংসার চলে আমাদের!

নানা বলছিল—তা তুমি যাই বলো বাপু! তোমার মত লোকের কাছ থেকে কোন জিনিস নিতে চাই না আমি। তুমি এবার পথ দেখতে পারো!

রুটিওয়ালাকে বিদায় করে উপরে উঠে এলো নানা।

উপরে উঠে জর্জকে দেখেই আবার তার পিত্তি জ্বলে উঠলো।

সে বললো—সেই থেকে এখনও বসে আছো? তোমার দেখছি লজ্জাও নেই। শেষে কি চাকর ডেকে অপমান করে বের করতে হবে নাকি তোমাকে?

জর্জ বললো—তোমার যা ইচ্ছে। কিন্তু আমার কথার উত্তর তোমাকে দিতেই হবে আজ। বলো, তুমি আমাকে বিয়ে করবে কি না?

নানা জর্জের কথার কোন উত্তর না দিয়েই শোবার ঘরে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করতে গেল।

জর্জ তখন তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে একহাতে দরজার পাল্লাটা ধরে বললো—কি, আমার কথা শুনতেই চাও না তুমি?

—কি শুনবো তোমার ঐ সব পাগলের প্রলাপ? তোমাকে অনেকবার বলেছি যে, আমার মন-মেজাজ ভাল নেই আজ। তবু কেন জালাতন করছো বলো তো। দরজা ছাড়ো। আমি একটু শুয়ে পড়তে চাই এখন।

নানার কথায় জর্জ আর কিছু না বলে হঠাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়ে সেই কাঁচিখানা বের করে সজোরে নিজের বুকে বসিয়ে দিল।

এই রকম একটা কাণ্ড যে ঘটতে পারে নানা, তা স্বপ্নেও ভাবেনি। সে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল জর্জের এই কাণ্ড দেখে। সে এমনই বিহ্বল ও স্তম্ভিত হইয়া পড়েছিল যে, জর্জকে বাধা দেবার কথাও তার মনে হ'লো না তখন।

জর্জকে এইভাবে বুকে কাঁচি বিঁধিয়ে দিতে দেখে হুঁস্ হলো নানার। তার মনে হ'লো যে, জর্জ যদি এইভাবে তার দরজার সামনে মরে পড়ে থাকে, তা হ'লে পুলিশ এসে তাকেই গ্রেপ্তার করবে আগে।

সে তখন বেশ একটু রাগের স্বরেই বলেলো—মরতে হয় তো রাস্তায় গিয়ে মরগে। আমার বাড়ীতে মরে আর জালিও না।

জর্জ তখন কাঁচিখানা বুক থেকে টেনে তুলে ফেললো। কাঁচিখানা বুক থেকে বেরিয়ে আসতেই ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটলো সেই ক্ষতস্থান থেকে।

জর্জ বলল—কি বললে ? রা-স্তা-য়—গি-য়ে—ম-র-বো ? এই বলেই সে আর একবার কাঁচিখানা বুকের মধ্যে বিঁধিয়ে দিল।

এই দ্বিতীয়বার আঘাতের পর জর্জ একটা অস্ফুট কাতরোক্তি করে ঘরের মেঝের কার্পেটের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

তার বুকের ক্ষতস্থান থেকে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত পড়তে লাগলো কার্পেটের উপরে।

এই আকস্মিক ব্যাপারে নানা হতভম্ব হয়ে চীৎকার করে উঠলো—জো! জো! শীগ্‌গীর আয়, জর্জ আত্মহত্যা করেছে।

নানার চীৎকার শুনে জো ছুটে এসে ব্যাপার দেখে ভয়ে শিউরে উঠলো।

জো জিজ্ঞাসা করলো—এ কি কাণ্ড দিদিমনি ?

নানা তখন ভয়ে থর থর করে কাঁপছে।

সে বললো—ত্মাখ্‌ তো কি বিপদ! আত্মহত্যা করার আর জায়গা পেলো না ছোঁড়া!

নানার কথা শেষ—হ'তেই সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। ওরা তু'জনেই তখন চমকে উঠে তাকালো সিঁড়ির দিকে।

মাদাম্ হিউজেন আসছিলেন সিঁড়ি দিয়ে উঠে তখন।

মাদাম্ হিউজেন নানার ঘরের সামনে আসতেই সে পাগলের মত চীৎকার করে বলে উঠলো—এই দেখুন আপনার ছেলের কাণ্ড! আমার টেবিল থেকে কাঁচি নিয়ে নিজের বুকে নিজেই বসিয়ে দিয়েছে ও।

মাদাম্ একবার নানার দিকে আর একবার মেঝের উপর পড়ে থাকা রক্তপ্লুত জর্জের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে তেমনি নিঃশব্দেই জর্জের পাশে বসে পড়লেন।

মুমূর্ষু ছেলের মাথাটাকে কোলের উপরে টেনে নিলেন তিনি।

হায় হতভাগিনি মা!

তোমার একছেলে অপরাধ করে জেলে, আর এক ছেলে আত্মঘাতী!

মাদামের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়।

জর্জকে নিয়ে কি করবেন তিনি বুঝে উঠতে না পেরে পাগলের মত তার বুকের ক্ষতস্থানের উপর হাত চেপে ধরলেন তিনি। তিনি হয়ত রক্ত বন্ধ করতে চাইছিলেন হাত চাপা দিয়ে।

এই সময় নানার হঠাৎ মনে হ'লো যে, মাদাম বুঝি তাকেই হত্যাকারী ভাবছেন। সে তখন নিজের সাফাই গাইতে বললো—আমার কোনই দোষ নেই এ ব্যাপারে। ও আমাকে বিয়ে করতে চাইছিলো, কিন্তু আমি ওকে বিয়ে করতে পারবো না বলতেই ও এই কাণ্ডটি করে বসেছে।

মাদাম কিন্তু কোন কথাই বললেন না। তাঁর বুকের মধ্যে যেন ঝড় বইছিল তখন। তিনি ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে জর্জের মাথাটি কার্পেটের উপর নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর নিঃশব্দে বাইরে গিয়ে গাড়ী থেকে কোচম্যানকে ডেকে নিয়ে এসে দু'জনে ধরাধরি করে জর্জকে নিয়ে চললেন।

যাবার সময় নানার দিকে তাকিয়ে তিনি বলে গেলেন—আমার সংসারে তুমি আগুন জেলে দিলে!

ষোলো

মাদাম হিউজেন চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই কাউন্ট মাফাত্ এসে উপস্থিত হলেন নানার বাড়ীতে।

কাউন্টকে দেখতে পেয়েই নানা তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বললো—সর্বনাশ হয়ে গেছে, কাউন্ট !

—কি ব্যাপার ?

—সাংঘাতিক কাণ্ড ! জর্জ আত্মহত্যা করেছে !

—জর্জ আত্মহত্যা করেছে ! কখন ? কোথায় ?

—এই তো কিছুক্ষণ আগে। ও এসে আমার কাছে প্যানর-প্যানর করতে স্বরু করেছিল ওকে বিয়ে করতে হবে বলে।

—তারপঁর ?

—তারপর আমি যেই বললাম বিয়ে-ফিয়ে আমার দ্বারা হবে না, তা ছাড়া তাকে আমি সেভাবে ভালবাসিও না, তখন ও হঠাৎ আমার টেবিলের উপর থেকে একখানা কাঁচি তুলে নিয়ে বুকে বসিয়ে দিলো ! ছাখো দেখি কি ফ্যাসাদ !

—মারা গেছে নাকি ?

—না, এখনও বোধ হয় মরেনি। এইতো কিছুক্ষণ হয় ওর মা এসে নিয়ে গেল ওকে।

—ওর মা ! মাদাম হিউজেন এসেছিলেন এখানে ?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তিনিই তো নিয়ে গেলেন জর্জকে। আচ্ছা তুমিই বল না—জর্জকে কি আমি আত্মহত্যা করতে বলেছি নাকি ? মরবার আর জায়গা খুঁজে পেল না ও !

এই সময় জো'কে ওখানে আসতে দেখে নানা বললো—বল্ না জো, কাউন্টকে সব কথা খুলে বল্ তুই।

জো হাত থেকে গরম জলের গামলা আর তোয়ালেটা দরজার কাছে নামিয়ে রেখে গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে ঘষে ঘষে রক্তের দাগ তুলতে তুলতে বললো—সত্যিই কাউণ্ট, এরকম সাংঘাতিক কাণ্ডের কথা আমার জীবনেও শুনিনি।

ব্যাপারটা এতই মর্মান্তিক এবং কাউণ্টের কাছে এই ব্যাপারটা এতই আকস্মিক যে, তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হ'লো না। কাঠের নির্বাক পুতুলের মত ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

নানার দিকে তাকিয়ে কাউণ্ট দেখতে পেলেন যে, তার দু' চোখ দিয়ে তখন টপ টপ করে জল পড়ছে।

নানাকে কাঁদতে দেখে কাউণ্ট সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন তাকে। তিনি বললেন—কেঁদে কি করবে, নানা? যার আয়ু ফুরিয়েছে, তাকে যেতেই হবে।

কাঁদতে কাঁদতেই নানা বললো—কিন্তু তুমি জানো না, কাউণ্ট, জর্জ সত্যিই প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো আমাকে। তোমার জন্যই তো আমি ওকে দূর দূর করে তাড়াতাম সব সময়। আজ জর্জ মরে গেছে তাই বলছি,—ওকে আমি সত্যিই ভালবাসতাম। যাক, আর তোমার সুখের পথে ও কোনদিন কাঁটা হয়ে আসবে না। জর্জ—জর্জ—ওহো হো হো···

দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়লো নানা।

কাউণ্ট সস্নেহে নানার চুলের উপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—কেঁদো না, নানা! জর্জ হয়তো মরেনি, চিকিৎসা করলে হয়তো বেঁচে যাবে ও।

—বেঁচে যাবে! সত্যি বলছ তুমি? বেঁচে যাবে জর্জ?

—হয়তো বাঁচবে। আমি এখনই যাচ্ছি মাদাম হিউজেনের বাড়ীতে। দেখি কি অবস্থা ওর।

* * *

মাদাম হিউজেনের বাড়ীতে গিয়ে কাউণ্ট মাফাত্ দেখতে পেলেন যে, তিনি যা অনুমান করেছিলেন, তা-ই ঠিক! জর্জ মারা যায় নি। ডাক্তার নাকি ভরসা দিয়েছে যে, এ যাত্রা বেঁচে যাবে ও।

কাউণ্ট তখন মাদামকে সান্ত্বনা দিয়ে আবার ফিরে এলেন নানার বাড়ীতে। কাউণ্টকে দেখেই নানা জিজ্ঞাসা করলো—কি রকম দেখলে ? বেঁচে আছে জর্জ ?

—হ্যাঁ আছে! ডাক্তার বলেছে যে, এ যাত্রা বেঁচে যাবে ও।

কাউণ্টের মুখে এই খবর পেয়ে নানা একেবারে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। মনের ভাব গোপন রাখতে না পেরে খুশির আমেজে নাচতে সুরু করলো সে।

জর্জ বেঁচে আছে!

এর চেয়ে ভাল খবর আর কী হতে পারে!

এই সময় জো এসে বললো—রক্তের দাগগুলো যে যাচ্ছে না, দিদিমণি ?

—না যায়, থাক্। পায় পায় আপনিই উঠে যাবে।

নানার এইরকম আনন্দ-উদ্বেলিত ভাব দেখে কাউণ্টের রাগ হ'লো মনে মনে। জর্জের উপরেই গিয়ে পড়ল তাঁর সব রাগ।

"ছোড়াটা মরলেও ছিল ভাল"—এই রকম মনে হ'লো তাঁর।

দু'ঘণ্টা আগেও কিন্তু কাউণ্টের মনের ভাব ছিল অন্যরকম। তিনি যখন নানার বাড়ী থেকে বের হ'য়ে মাদাম হিউজেনের বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর বার বার মনে হচ্ছিলো যে, জর্জের মত দশা তো তাঁরও হতে পারে। তিনি যাবার পথে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, নানার বাড়ীতে আর তিনি যাবেন না।

কিন্তু মাদাম হিউজেনের বাড়ীতে পৌছে জর্জ বেঁচে আছে দেখেই তাঁর মনের সেই অবস্থা বদলে গেল। জর্জকে দেখে তার প্রতি দয়া বা সহানুভূতির পরিবর্তে কাউণ্টের মনে এলো ঈর্ষা। তাঁর কেবলই মনে হ'তে লাগলো যে, এই ছোকরাটার জন্যই নানা তাঁকে ভালবাসে না।

কাউণ্টকে চুপ করে থাকতে দেখে নানা জিজ্ঞাসা করলো—কি গো ? চুপ করে বসে আছ যে বড় ?

—চুপ করে থাকবো না তো কি তোমার মত ধেই ধেই করে নাচবো নাকি ?

কাউণ্টের মনের ভিতরে তখন ঝড় বইছিলো।

কিছুক্ষণ পরেই "শরীরটা ভাল লাগছে না" বলে কাউণ্ট বিদায় নিলেন নানার কাছ থেকে।

বাড়ীতে ফিরে এসেও কিন্তু শান্তি পেলেন না কাউণ্ট। তাঁর মনে বার বার একই কথা ঘুরে ফিরে আসতে লাগলো—"জর্জ! জর্জই আমার পথের কাঁটা।"

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে কাউণ্ট মাফাত্ একদিন দুপুরের পরে নানার বাড়ীতে আসতেই দেখতে পেলেন, নানার বাড়ী থেকে কাউণ্ট ফুকারমণ্ট বেরিয়ে যাচ্ছেন।

কাউণ্ট ফুকারমণ্টকে নানার বাড়ী থেকে বেরুতে দেখেই কাউণ্ট মাফাতের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠলো। রাগে আগুন হ'য়ে তিনি তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলায় উঠতে লাগলেন। তাঁর উত্তেজনা এত বেশী হয়েছিল যে, দোতলায় উঠতে বার দুয়েক হোঁচটও খেলেন তিনি।

দোতলায় উঠে সোজা নানার ঘরে গিয়ে বেশ একটু উষ্মার সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলেন তিনি—ফুকারমণ্ট এখানে এসেছিল কেন?

কাউণ্টের কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় নানা প্রথমটা একটু বিব্রত বোধ করলেও পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিলো সে—হ্যাঁ, এসেছিলেন, কি হয়েছে তাতে?

—তার মানে? তুমি তা হ'লে ওর সঙ্গেও চালাচ্ছো?

—চালাচ্ছিই তো! আরও কিছু শুনতে চাও? কাউণ্ট ফুকারমণ্টকে আমি ভালবাসি।

—কি বললে?

—কেন শুনতে পাওনি নাকি? কাউণ্ট ফুকারমণ্ট এখানে আসে এবং ভবিষ্যতেও আসবে। এতে যদি তোমার কোন আপত্তি থাকে, তা হ'লে দরজা খোলা আছে, সোজা চলে যেতে পারো!

নানার এই সোজাসুজি অপমানেও কিন্তু কাউণ্ট গেলেন না ওখান থেকে, যেতে পারলেন না তিনি।

প্রেমের কারবারে নিজেকে দেউলে মনে হ'লো তাঁর।

তিনি তখন নরম হ'য়ে নানারকম মিষ্টি কথা বলে তোষামোদ করতে লাগলেন নানাকে।

কাউণ্টের রকম-সকম দেখে নানার বুঝতে দেরি হলো না যে, "উনি একেবারেই মরেছেন!"

এই ঘটনার পর নানা প্রায় প্রতিদিনই অপমান করতে লাগলো কাউণ্ট মাফাত্‌কে। এতদিন তার মনে কাউণ্ট সম্বন্ধে যদিও বা একটু ভয় ছিল, এর পর আর তা মোটেই থাকলো না। সে তখন রীতিমত দোকান খুলে বসলো বাড়ীতে।

কিছুদিনের মধ্যে সারা প্যারী সহরের গণ্যমান্য লোকেরা সবাই আনাগোনা করতে লাগলো নানার সেই প্রেমের দোকানে।

এই সময়টাকেই নানার জীবনের সবচেয়ে উদ্দাম অবস্থা বলা যেতে পারে। একের পর এক লক্ষপতির দল তাদের আজীবনের সঞ্চয় রিক্ত করে ঢেলে দিতে লাগলো নানার রূপের আগুনে।

কাউণ্ট মাফাতের এই সময়কার মনের অবস্থা একেবারে অবর্ণনীয়। তিনি যখন দেখলেন, তাঁরই দেওয়া বাড়ীতে বসে এবং তাঁরই মাসোহারায় যাবতীয় খরচ চালিয়ে প্রকাশ্যে বেশ্যাবৃত্তি করা স্থুরু করে দিয়েছে নানা, তখন তিনি একেবারেই মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁর অবস্থা তখন এমনই কঠিন যে, নানাকে মুখ ফুটে একটা কড়া কথা বলবারও তাঁর সাহস ছিল না। তাঁর সব সময়ই ভয় হ'তো যে, বেশী কিছু বললেই নানা তাঁকে আর তার বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না।

এইবার স্থুরু হয়ে গেল মক্কেল-বধের পালা।

প্রথমেই ঘায়েল হলেন কাউণ্ট ফুকারমণ্ট। এই কাউণ্ট মশাই কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর যাবতীয় ধনসম্পত্তি নানার বাড়ীতে ফুঁকে দিয়ে একেবারে ফতুর হ'য়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হ'লেন। দেনায় আর অর্থকষ্টে চোখে সরষে ফুল দেখে অবশেষে কোন জাহাজে সামান্য মাইনেতে এক নাবিকের চাকুরি জুটিয়ে দেশান্তরে পাড়ি দিলেন তিনি।

আরও কিছুদিন পরে খবর পাওয়া গেল যে, ফুকারমণ্ট নাকি জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন।

এর পরেই এলো ষ্টিনারের পালা। ষ্টিনার তখন এক লিমিটেড কোম্পানী খুলে সমানে লোককে ঠকিয়ে চলছিল। বসফরাস প্রণালীর তলা দিয়ে সুড়ঙ্গপথ তৈরী করে ফ্রান্সের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ধারা পালটে দেওয়া হবে বলে বিজ্ঞাপন দিয়ে বহু লক্ষ ফ্রাঙ্কের শেয়ার বিক্রি করেছিল সে।

কিন্তু যত টাকাই সে রোজগার করুক না কেন, নানার ফার্ণেসের আগুনে সে টাকা পিচকারীর জলের মত বাষ্প হ'য়ে উড়ে যেতে দেরি হলো না।

ষ্টিনার দেউলে হ'লো।

নানা যখন টের পেলো যে, ষ্টিনারের রসদ ফুরিয়েছে, সে তখন তাকে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত দূরে ফেলে দিল।

কয়েকদিন পর এক সন্ধ্যায় ষ্টিনার এসে নানার কাছে ভিখিরীর মত হাত পেতে দাঁড়ালো মাত্র একশ'টি ফ্রাঙ্ক চেয়ে। ষ্টিনার বললো যে, মাত্র একশ' ফ্রাঙ্কের জন্য সে নাকি পুলিশের হাতে ধরা পড়তে চলেছে।

নানা তাকে টাকাটা দিল বটে, কিন্তু বলে দিল যে, সে যেন আর কোনদিন তার কাছে এভাবে টাকা চাইতে না আসে।

ষ্টিনারের পরেই এলো হেক্তরের পালা।

হেক্তরের কিছু সম্পত্তি ছিল। সে তার যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রি করে নানার বাড়ীতে কাপ্তেনী করতে এসে কয়েকদিনের মধ্যেই সর্বস্ব ফুঁকে দিল। তার ছাপাখানাটাও বিক্রি হ'য়ে গেল দেনার দায়ে। সে তখন আর উপায়ান্তর

না দেখে একদা নৈশ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে প্যারী থেকে পালিয়ে চলে গেল। কোন্ এক পল্লীগ্রামে নাকি তার কে এক আত্মীয় ছিল, তার বাড়ীতেই গিয়ে হাজির হ'লো সে।

এই ডামাডোলের বাজারে 'ফিগারো'-সম্পাদক মঁসিয়ে ফুচেরির খবরটা নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা হচ্ছে আপনাদের। ফুচেরি যে পাখোয়াজ লোক, সে খবর নূতন করে বলবার দরকার হবে না নিশ্চয়ই? সে যখন দেখলো যে, হেক্তর নানার বাড়ীতে যাতায়াত সুরু করেছে, তখনই সে বুঝতে পেরেছিল যে, ওর হ'য়ে এসেছে। তাই সে সময় থাকতেই আর একটি ফিনান্সিয়ারকে বধ করে এক নূতন ছাপাখানা আর পত্রিকা খুলে বসলো।

কাউণ্টেস স্যাবাইনকে সে ছেড়ে দিয়েছিল। সে তখন রোজির সঙ্গে প্রেম চালাচ্ছিলো তার স্বামীর সঙ্গে পার্টনারশিপে। মঁসিয়ে মিগনন বোধ হয় 'স্ত্রী-ভাগ্যে ধন'—এই প্রবাদবাক্যটিতে বিশ্বাসী ছিলেন। শুনতে পাওয়া যেতো যে, মঁসিয়ে মিগনন নাকি তার স্ত্রী আর সম্পাদক সাহেবের সুখের জন্য সর্বদাই তাদের ফাই-ফরমাস খাটতো।

এঁটো পাত চাটা যে-সব কুকুরের অভ্যাস, তারা যেমন হাজার ভাল খাবার পেলেও এঁটো পাত দেখলেই চাটবার লোভ সামলাতে পারে না, সম্পাদক সাহেবের স্বভাবটিও ছিল ঠিক সেই রকম। রোজির বাড়ীতে স্বামী-আদরে (?) থাকলেও সুযোগ পেলেই সে ছুটতো নানার বাড়ীতে। সে তার নূতন মক্কেলের ঘাড় ভেঙ্গে টাকা এনে অঞ্জলি দিতো নানার শ্রীচরণে।

কিন্তু নানার আবদারের ধাক্কা সামলাতে সেও একদিন তার ফিনান্সিয়ারকে পথে বসিয়ে তার ছাপাখানাটি বিক্রি করে ফেললো।

সতেরো

অনেকদিন কাউণ্ট মাফাতের খোঁজ নেওয়া হয় নি।

বেচারা কাউণ্টের তখন চরম অবস্থা। নানার ঘরে সব সময়ই লোকজনের আনাগোনা, তাই বেচারা যে দু'দণ্ড তার পাশে বসে একটু পীরিতের কথা বলবে, তার উপায় ছিল না। কাউণ্ট যখনই আসতেন, তখনই শুনতে পেতেন—নানার ঘরে লোক আছে। অনেক দিন হাঁটাহাঁটি করবার পর একদিন হঠাৎ ঘর খালি পেয়ে কাউণ্ট নানার কাছে বসবার সুযোগ পেলেন।

কাউণ্টকে ঘরে ঢুকতে দেখেই নানা বলল—কি কাউণ্ট, তোমাকে যে আজকাল আর দেখতেই পাওয়া যায় না ?

কাউণ্ট বললেন—কি ক'রে পাবে বলো ? তোমার ঘরে তো দেখি সব সময়ই লোক।

—তা যা বলেছো ! লোকগুলোর দেখছি সময়-অসময় জ্ঞানও নেই। তা যাই হোক, আজ যখন তোমাকে পেয়েছি, তখন আমার একটা সাধ আজ মেটাতেই হবে তোমাকে।

—কি সাধ বলো তো ?

—আমার ইচ্ছে যে, তুমি ঘোড়া হবে, আর আমি তোমার পিঠে সওয়ার হয়ে চাপবো।

—আমি ঘোড়া হবো !

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। এ ঘরে তো তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই যে দেখতে পাবে। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেই হবে।

—বেশ ! তোমার কোন্ সাধটাই বা না মিটিয়েছি আমি ?

নানা তখন উঠে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতেই কাউণ্ট মাফাত্-স্থ-বোভাইল ঘরের মেঝের উপরে হামাগুড়ি দিয়ে ঘোড়া হয়ে বললেন—এই তো হয়েছি ঘোড়া, এসো ?

নানা তখন কাউণ্টের পিঠে চড়ে হেট্ হেট্ করে ঘোড়া চালাতে লাগলো, আর কাউণ্ট মাঝে মাঝে চিঁ-হিঁ চিঁ-হিঁ শব্দ করতে লাগলেন।

এইভাবে কিছুক্ষণ ঘোড়া-ঘোড়া খেলবার পর নানা কাউণ্টের পিঠ থেকে নেমে বললো—নাঃ! এ খেলাটা তেমন জমছে না! তুমি বরং ভালুক হও আর আমি হই ভালুকী।

এই কথা বলেই একটা লোমওয়ালা কম্বল নিয়ে এসে কাউণ্টের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে তাকে জাপটে ধরে মেঝের উপরে ফেলে আঁচড়ে, কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে তুললো।

ভালুকের খেলা শেষ হ'য়ে গেলে নানা একখানা রুমাল বের করে এনে বললো—এইবার তুমি কুকুর হবে, বুঝলে ? আমি এই রুমালখানা ফেলে দিয়ে বলবো—জিম, লে আও! আর তুমি তখন চারপায়ে ছুটে গিয়ে দাঁত দিয়ে রুমালখানা তুলে নিয়ে আসবে।

ভালুক সেজেই কাউণ্টের প্রাণ যায়-যায় অবস্থা হ'য়ে পড়েছিল, তাই কুকুর সাজবার কথায় তাঁর আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হবার উপক্রম হ'লো।

কিন্তু উপায় নেই! নানা যখন বলেছে, তখন কুকুর তাঁকে সাজতেই হবে।

কাউণ্ট তখন কম্বলখানা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে মেঝের উপরে হামাগুড়ি দিয়ে বসে বললেন—আমি তৈরী!

নানা তখন তার হাতের রুমালখানা দূরে ফেলে দিয়ে বললো—লে আও, জিম!

কাউণ্ট তখন হামাগুড়ি দিয়ে ছুটলেন সেই রুমালখানা নিয়ে আসতে। মেঝের উপর থেকে দাঁত দিয়ে রুমাল তোলবার সময়কার কাউণ্টের প্রাণান্ত

প্রয়াস লক্ষ্য করে নানার সে কি আনন্দ! খুশিতে হাততালি দিয়ে সে বললো —বাহবা জিম, বহুৎ আচ্ছা! ঠিক হ্যায়, জলদি উঠা লেও!

বারকয়েক রুমাল তুলে আনতেই কাউন্ট একেবারে হাঁপিয়ে উঠলেন।

তিনি বললেন—আর পারছি না, নানা! আজ এই পর্যন্তই থাক।

* * *

এর কয়েক দিন পরেই কেবিনেট-মেকার এসে কাউন্ট মাফাত্‌কে খবর দিল যে, নানার খাট তৈরী হয়ে গেছে।

নানাও ঠিক এই সময়টাতেই চব্বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক দাবী করে বসলো তাঁর কাছে। কাউন্ট হিসাব করে দেখলেন যে, নানার খাটের দাম আর আবদারের খাঁই মেটাতে তখনই পঞ্চান্ন হাজার ফ্রাঙ্ক চাই তাঁর। এ ছাড়া বাড়ীর খরচ এবং তার নিজের খরচ তো আছেই।

এত টাকা কোথা থেকে পাওয়া যাবে বুঝে উঠতে না পেরে কাউন্ট স্থির করলেন যে, তিনি তাঁর মফঃস্বলের একটা জমিদারি বিক্রি করে দেবেন।

যেমনি ভাবনা অমনি কাজ। কাউন্ট আর দেরি না ক'রে মফঃস্বলে বেরিয়ে পড়লেন তাঁর জমিদারি বিক্রি করতে। অবশ্য যাবার আগে নানার সঙ্গে দেখা করে বলে গেলেন যে, চার পাঁচ দিনের ভিতরেই টাকার যোগাড় করে ফিরে আসছেন তিনি।

নানা কিন্তু কাউন্টের বাইরে যাবার এই সুযোগটাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করলো। এবারে সে কাউন্টের শ্বশুর বুড়ো মার্ক্‌ইস-দ্য-কুয়ার্দকেই গেঁথে ফেললো। বুড়ো মার্ক্‌ইস নানার প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খেতে লাগলেন জামাইয়ের অনুপস্থিতিতে।

এদিকে মফঃস্বলের জমিদারি বিক্রি করতে কাউন্ট মাফাতের মোটেই দেরি হ'লো না। তিন দিনের মধ্যেই কাজ শেষ করে টাকা নিয়ে কাউন্ট ফিরে এলেন প্যারীতে। প্যারীতে এসে প্রথমেই গেলেন তিনি নানার বাড়ীতে।

তাঁর ধারণা যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে নানা বোধ হয় খুবই অসুবিধা ভোগ করছে টাকার অভাবে।

নানার বাড়ীতে তিনি যখন হাজির হলেন, তখন বেশ একটু রাত হয়েছে। ওখানকার সদর দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন। সদর দরজা বন্ধ দেখে কাউন্ট বাড়ীর পেছনের খিড়কি দরজা দিয়েই ঢুকে পড়লেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, খিড়কি দরজার একটা চাবি সব সময়ই কাউন্টের কাছে থাকতো।

হঠাৎ বলা নেই—কওয়া নেই, অতো রাত্রে কাউন্ট মাফাতকে দেখে জো কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়লো। সে তাড়াতাড়ি কাউন্টের কাছে গিয়ে তাঁকে নানার ঘরে না ঢুকতে অনুরোধ করলো।

সে বললো—আপনি এখন দিদিমণির ঘরে যাবেন না কাউন্ট !

—কেন বলো তো ?

—না, মানে দিদিমণি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাই।

কাউন্ট বাধা দিয়ে বললেন—না! আমার এখনই দেখা করা দরকার নানার সঙ্গে। আমার সঙ্গে অনেকগুলো টাকা রয়েছে। টাকাগুলো আমি নানার কাছে রেখে যেতে চাই।

জো বিব্রত হয়ে উঠলো কাউন্টের কথায়।

সে বললো—কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে ?

—নিশ্চয়ই ঠিক হবে। তুমি পথ ছাড়ো।

জো'র কথায় কান না দিয়ে কাউন্ট নানার ঘরের দিকে গেলেন।

নানার ঘরের দরজাটা ভেজানো রয়েছে দেখে কাউন্ট ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললেন।

কিন্তু দরজা খুলেই যে দৃশ্য দেখলেন, তাতে একেবারে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন তিনি।

তাঁর মুখ দিয়ে শুধু একটি মাত্র কথা বের হ'লো—"ভগবান !"

তিনি দেখলেন যে, নানার খাটের উপরে নানার বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছেন তাঁরই শ্বশুর—মাকু´ইস-দ্য-কুয়ার্দ!

কাউণ্টকে দেখে নানা কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে হেসে বললো—মাত্র চার হাজার ফ্রাঙ্কের জন্য তোমাকে জমিদারি বিক্রি করতে মফঃস্বলে ছুটতে হয়েছিল! কিন্তু মাকু´ইস ও টাকাটা এখান থেকেই দিয়েছেন আমাকে। এখন থেকে মাকু´ইসই আমার দেখাশোনার যাবতীয় ভার নিয়েছেন, বুঝলে?

কাউণ্ট মাফাত্ কিছুক্ষণ স্থানুর মত দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশব্দে পিছন ফিরে সিঁড়ির দিকে চলতে লাগলেন। আর এক মুহূর্তও নানার বাড়ীতে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছিল না তাঁর। ওখানকার বাতাসে যেন বিষ মেশানো আছে বলে মনে হ'তে লাগলো তাঁর। তিনি পাগলের মত সিঁড়ি দিয়ে নেমে খিড়কির দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

নানার ঘরে শ্বশুরমশাইকে দেখা অবধি তিনি কি যে করবেন, তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এক একবার আত্মহত্যা করতেও ইচ্ছা হচ্ছিলো তাঁর।

পাগলের মত টলতে টলতে রাস্তা দিয়ে চলছিলেন তিনি। কখন যে বাড়ীতে পৌছেছেন, সে খেয়ালও তাঁর ছিল না হয়তো। হঠাৎ পিছন থেকে পিঠের উপরে কার হাত পড়তেই চমকে উঠলেন তিনি। ফিরে তাকাতেই তিনি দেখলেন—মঁসিয়ে ভেনো দাঁড়িয়ে।

মঁসিয়ে ভেনোকে দেখে কাউণ্ট আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না। তিনি তাঁর একখানা হাত ধরে বললেন—আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ঐ রাক্ষুসী সর্পিনীর কবল থেকে আপনি আমাকে বাঁচান!

মঁসিয়ে ভেনো কাউণ্টকে তাঁর বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন—বিপদে অধৈর্য হ'তে নেই, কাউণ্ট। ভগবানের উপরে বিশ্বাস রাখুন, তিনিই আপনাকে রক্ষা করবেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মঁসিয়ে ভেনো আবার বললেন—একটা নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনবার জন্য হৃদয়কে দৃঢ় করুন, কাউণ্ট।

কাউণ্টের বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠলো মঁসিয়ে ভেনোর এই ভূমিকায়।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কি ?…

—কাউণ্টেস গৃহত্যাগ করেছেন।

—কি বললেন ?

—লজ্জার কথা হ'লেও আমাকে বলতে হচ্ছে। শহরের এক ছবির দোকানদারের সঙ্গে কাউণ্টেস কুলত্যাগ করেছেন। এই ব্যাপার নিয়ে শহরময় একেবারে হুলুস্থুল পড়ে গেছে।

মঁসিয়ে ভেনোর মুখে এই খবর শুনে কাউণ্ট মাফাত্ দুইহাতে মুখ ঢেকে একখানা সোফার উপরে বসে পড়লেন। মুখের উপর থেকে হাত সরাতেও লজ্জা হচ্ছিলো তাঁর তখন।

হায় কাউণ্ট! এ কী অবস্থা আজ তোমার ?

নানার বাড়ী থেকে অপমানিত ও বিতাড়িত হ'য়ে যার কাছে এসে দাঁড়াবেন মনে করেছিলেন, সেই কাউণ্টেস স্যাবাইনও আজ মাফাত্-পরিবারের সুনাম ও মর্যাদা ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে একজন সামান্য ছবিওয়ালার সঙ্গে গৃহত্যাগ করলো!

*　　　*　　　*

শ্বশুর-জামাইতে মাথা-ঠোকাঠুকি হ'য়ে যাওয়ায় নানা মনে মনে খুশীই হ'লো। কিছুদিন থেকেই কাউণ্টের সাহচর্য তার অসহ্য বোধ হচ্ছিলো। তাই আপদ বিদায় হ'লো মনে করে সে প্রথমটা আনন্দিতই হ'লো। কিন্তু এ আনন্দ তার বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'লো না। অনেক রাত্রে মার্কুইস্ যখন ধুঁকতে ধুঁকতে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন, তখন তাঁর সেই বার্দ্ধক্য-প্রপীড়িত ভগ্ন দেহটির দিকে তাকিয়ে নানার মনে হ'লো—এ তো দেখছি ঘাটের মড়া! এর উপর আর ক'দিনের ভরসা ?

হঠাৎ তার মনে পড়লো কাউণ্টের কথা। সে ভাবলো যে, কাউণ্টকে ঐভাবে অপমান করে বিদায় করা তার ঠিক হয় নি। এই ব্যাপারের পরেও যে সে আবার এ বাড়ীতে আসবে, এরকম মনে হ'লো না নানার।

পরদিন সকালে লা-বোর্দেত এসে খবর দিয়ে গেল—জর্জ মারা গেছে।

খবরটা শুনেই নানার বুকের ভিতরে ধড়াস করে উঠলো।

সে বললো—কি বললে? জর্জ মারা গেছে?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কে যেন তার দৃষ্টিকে টেনে নিয়ে গেল জর্জের রক্তমাখা কার্পেটের সেই জায়গাটিতে।

রক্তের সেই দাগটার দিকে অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো নানা। তারপর হঠাৎ কেঁদে উঠলো—জর্জ! প্রিয়তম জর্জ! আমার জন্যই তুমি প্রাণ দিলে!

* * *

জর্জের মৃত্যুসংবাদ শোনবার পর থেকেই নানা যেন কেমন হ'য়ে গেল। সে সব সময়ই আনমনা হ'য়ে থাকতো। রাজ্যের চিন্তা এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতো একা থাকলেই। কখনও কখনও তার মনে হ'তো—সে বুঝি জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছে।

এক রাত্রে সে স্বপ্ন দেখলো যে, তার অতুল ঐশ্বর্যের চারদিকে কেবলই যেন মরা মানুষের হাড়গোড় আর মাথার খুলি ছড়িয়ে রয়েছে। তার বিছানা, বাক্স, দেরাজ, আলমারি, পোশাক-পরিচ্ছদ সবই যেন স্তূপীকৃত নরকঙ্কাল আর গলিত মৃতদেহের স্তূপ।

এই নারকীয় পরিবেশের মধ্যে নানা একা! নানার মনে পড়লো যে, তারই জন্য কাউণ্ট ভাঁদেভো আগুনে পুড়ে মরেছে, ফুকারমণ্ট দেউলে হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ দিয়েছে, ব্যাঙ্কার স্টিনার আজ পথের ভিখিরীরও অধম। হেকৃতর দেনার দায়ে পলায়িত, ফিলিপি জেলে পচছে, জর্জ আত্মঘাতী এবং প্যারীর শ্রেষ্ঠ অভিজাতদের অন্যতম কাউণ্ট মাফাত্ আর তার পরিবারের সুনাম আজ লোকচক্ষে হেয়।

কী ভয়ানক! কী ভয়াবহ পরিণতি এদের!

নানার মনে হ'লো যে, এদের এই পরিণতির জন্য একমাত্র সে-ই দায়ী!

আবার এক এক সময় মনে হ'লো, সে ঠিকই করেছে। যেদিন অজ্ঞাতকুলশীলা ভিখারিণী বালিকা নানা প্যারীর পথে পথে বড়লোকদের কাছে একটি ফ্রাঙ্কের জন্যে হাত পেতে দাঁড়াতো, সেদিন তো কেউ সাহায্য করেনি তাকে! চরম অবহেলায় তারা গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেছে তার পাশ দিয়ে!

দোকানে সাজিয়ে-রাখা রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যগুলির দিকে তাকালেও যেদিন দোকানদার তেড়ে আসতো, সেদিনের কথাগুলো মনে পড়লো নানার।

এই ধনী পুরুষ জাত!

এরা এদের দেহের খিদে মেটাতে নারীকে ব্যবহার করে নির্লজ্জ পশুর মত। অভাবের সুযোগ নিয়ে এরা নারীর দেহে ঢেলে দেয় তীব্র বিষ।

কেন তা হ'লে সে প্রতিশোধ নেবে না?

ঠিক করেছে সে।

মন থেকে সাময়িক দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার সে চালাতে থাকে কাম দেবতার পূজা।

প্যারীর বিলাসী ধনীরা দলে দলে ছুটে এসে পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে নানার রূপের আগুনে।

আঠারো

কিছুদিন পরের কথা।

হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে নানা প্যারী থেকে ডুব দিল। চলে যাবার কয়েকদিন আগে সে তার যাবতীয় জিনিসপত্র, বাড়ী-ঘর, গয়নাপত্র সবকিছু নিলামে বিক্রি করে দিয়েছিল। এইভাবে সবকিছু বিক্রি করে পাঁচ লাখ ফ্রাঙ্ক পেয়েছিল সে।

প্যারীর লোকেরা নানাকে সর্বশেষ দেখতে পেয়েছিল গেইটি থিয়েটারে। এই থিয়েটারে সে এক পরীর ভূমিকায় নির্বাক অভিনয় করে অজস্র প্রশংসা লাভ করেছিল। নানার জীবনে এই অভিনয়ই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয়।

এই গেইটি থিয়েটারে নানার যোগদানের একটু ইতিহাস ছিল। ভ্যারাইটির ভূতপূর্ব ম্যানেজার বার্দেনেভ্ অনেক টাকা লোকসান দিয়ে একেবারে বেসামাল হয়ে পড়েছিল। বেচারা যখন থিয়েটার লাইন ছেড়ে দিয়ে অন্য কিভাবে টাকা রোজগার করা যায়—সেই কথা ভাবছিল, সেইসময় দৈবক্রমে গেইটি থিয়েটারটা তার হাতে এসে যায় একরকম বিনামূল্যেই।

এই থিয়েটারটা হাতে আসতেই সে নানাকে ধরে পড়লো ওখানে অভিনয় করবার জন্য। বার্দেনেভের কাকুতি-মিনতিতে নানাও রাজী হ'য়ে গেল আবার স্টেজে নামতে।

ম্যানেজার তখন আবার পূর্ণোদ্যমে কাজ সুরু করে দিল।

রঙ-বেরঙের পোস্টার আর লক্ষ লক্ষ হাণ্ডবিল ছাপিয়ে সে সহরময় আঁটবার আর বিলি করবার ব্যবস্থা করে ফেললো।

এরপর থেকেই আবার সহরের লোকদের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো গেইটি থিয়েটার আর নানার নাম।

এইভাবে গেইটি থিয়েটার আবার যখন জমজমাট হয়ে উঠেছে, সেই সময় একদিন একটা সামান্য কথা নিয়ে ম্যানেজারের তর্কাতর্কি হ'লো নানার সঙ্গে। তার দু'দিন পরেই উধাও হ'লো নানা।

যেদিন নানা চলে গেল, সেদিনও তার অভিনয় করবার কথা ছিল। অগণিত দর্শক এসেছিল নানার অভিনয় দেখবার আকুল আগ্রহ নিয়ে, কিন্তু তারা যখন জানতে পারলো যে, নানা অভিনয় করবে না, তখন তারা ম্যানেজারের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে চলে গেল থিয়েটার না দেখেই।

কয়েক মাস পরে।

নানার কথা লোকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল।

তবুও নানার বন্ধুবান্ধব আর চেনা-জানা লোকেরা মাঝে মাঝে তার সম্বন্ধে খবরাখবর নেবার চেষ্টা করতো।

নানার সম্বন্ধে গুজবের নৌকা শুকনো দিয়ে চলতে সুরু করছিল। কেউ কেউ বলতো যে, নানা নাকি কোন্ এক বড়লোকের ছেলেকে বিয়ে করে সতী-সাধ্বী স্ত্রী হয়ে সংসারধর্ম পালন করছে। আবার কেউ কেউ বলতো যে, সে নাকি এক রাজাকে বিয়ে করে রাণী হয়ে বসেছে মাদাগাস্কার না মধ্য এশিয়ায়। আর একদিন কে একজন খবর দিল যে, নানা নাকি এক কাফ্রীর পীরিতে দেশ-ছাড়া হয়েছে। কাফ্রীর প্রেমের ঠেলায় নানা নাকি এখন সে কায়রোর পথে পথে ভিক্ষে করে ফিরছে।

আর একদিন শোনা গেল যে, নানা সত্যিই রাণী হয়েছে। রাজাবাহাদুর নাকি নানাকে হীরে-মুক্তো আর সোনা দিয়ে একেবারে মুড়ে দিয়েছেন। নানা যে হীরেগুলো সবসময় পরে থাকে, তার প্রত্যেকখানার দামই নাকি কয়েক-লাখ ফ্রাঙ্ক।

এমনি সব গুজব যখন নানার সম্বন্ধে চলছিল, সেইসময় একদিন লুসির সঙ্গে কেরোলিনার দেখা হ'লো রাস্তায়।

লুসি বললো—নানা আবার ফিরে এসেছে, জানো ?

—তাই নাকি! কবে এলো ? কোথায় আছে সে ?

লুসী বললো—শুনলাম, নানার নাকি খুব অসুখ। বাঁচে কি মরে অবস্থা।

—তাই নাকি ? কি হয়েছে নানার ?

—শুনলাম, বসন্ত হয়েছে। গ্র্যাণ্ড হোটেলের একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে আছে সে। আরও শুনলাম, সে নাকি রাশিয়া থেকে পালিয়ে এসেছে তার পীরিতের নাগরের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে। ট্রেন থেকে নেমেই ও গিয়েছিল ওর মাসির বাড়ীতে ওর ছেলেটাকে দেখতে।

—মাসি! মাসি আবার এলো কোথা থেকে ?

—তা জানিনে ভাই! তবে টাকা থাকলে মাসি কেন মাসির মা, বোন সুদ্ধু জোটে!

—তারপর ?

—তারপর আর কি ? মাসির বাড়ীতে গিয়ে নানা দেখলো যে, তার ছেলেটার বসন্ত হয়েছে। ছেলেটা অবশ্য বাঁচলো না, কিন্তু নানাকেও ধরলো ঐ রোগে। শুনলাম, মিগনন নাকি ওকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে ঘর ভাড়া করে দিয়েছে।

—তুমি কার কাছে শুনলে এত কথা ?

—রোজির কাছে। ও আজই দেখা করে এসেছে নানার সঙ্গে। ও বললো যে, নানা যে ঘরে রয়েছে, সে ঘরখানা নাকি খুবই ছোট। যে নানা একদিন রাণীর হালে থেকেছে, তার ঘরে এখন জিনিসপত্র রাখবার মত জায়গাও নেই! ওর জিনিসপত্র সবই নাকি স্টেশনে পড়ে রয়েছে!

—তুমি কি যাচ্ছো নাকি নানার ওখানে ?

—হ্যাঁ ভাই। যাবে তুমি ?

—তা গেলে হয়। চলো, তা হ'লে একসঙ্গেই যাওয়া যাক্। কেরোলিনা উঠে আসে লুসির গাড়ীতে।

গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে গাড়ী দাঁড় করাতেই পারে না ওরা। অসংখ্য লোক তখন রাস্তা আর ফুটপাথ বন্ধ করে হল্লা করতে করতে ছুটছিল।

এই হল্লা আর চীৎকারের কারণ এই যে, ঐ দিনই জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ফ্রান্স।

ফ্রান্সের আইনসভায় যুদ্ধ-ঘোষণার প্রস্তাব পাশ হ'তেই সারা প্যারী যেন হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে উঠলো। জনতার মুখে তখন একই স্লোগান—"চলো বার্লিন!"

লুসি আর কেরোলিনা অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলে গ্র্যাণ্ড হোটেলের দরজার সামনে আসতেই মিগননের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল তাদের।

তাকে দেখে লুসি জিজ্ঞাসা করলো—নানা কেমন আছে এখন ?

মিগনন বললো—কেমন আছে, তা আমি কি করে জানবো ? আমি কি তার ঘরে গেছি নাকি ?

—তবে ? প্রশ্ন করলো লুসি।

—তবে আবার কি ? আমার বিপদ হয়েছে রোজিকে নিয়ে। ও যে সেই কাল এসে নানার ঘরে ঢুকেছে, তার পর আর বেরোবার নামও করছে না ! কি বিপদ বলো দেখি ?

ওদের যখন এইসব কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, সেই সময় সম্পাদক মশাইকে দেখা গেল ওদের দিকে আসতে।

তাকে দেখেই মিগনন বললো—দেখুন দেখি কি বিপদ! এই সব সাংঘাতিক ছোঁয়াচে রোগের কাছে আবার কেউ যায় নাকি ?

—কি হয়েছে ? জিজ্ঞাসা করলো সম্পাদক।

—আর কি হয়েছে ! রোজি সেই যে কাল সকালে এসে নানার ঘরে ঢুকেছে, তারপর থেকে আর বাড়ী যাবার নামটিও করেনি।

সম্পাদক বললো—তাই নাকি ? তা হ'লে তো বড়ই মুশকিলের কথা দেখছি !

মিগনন বললো—মুশকিল বলে মুশকিল ! এখন কি করি বলুন তো ? আপনি যদি একবার···

মিগননের কথায় বাধা দিয়ে সম্পাদক বললো—আপনি বলেন কি মঁসিয়ে মিগনন ! আমি যাবো ঐ রুগীর ঘরে ? না মশাই, ও-কাজ আমার দ্বারা হবে না।

এই সময় রাস্তা ও ফুটপাথের ভিড়ের মধ্যে ফণ্টানকে দেখতে পেয়ে লুসি ডাকলো তাকে।

ফণ্টান কাছে আসতেই লুসি বললো—নানার ভয়ানক অসুখ, শুনেছো সে খবর ?

ফণ্টান বললো—তাই নাকি ? কি হয়েছে তার ?

মিগনন বললো—বসন্ত।

—বসন্ত ! ওরে বাবা ! সে যে বড় সাংঘাতিক রোগ !

—তা যা বলেছো ! আমার এক ভাইঝি মারা গিয়েছিল বসন্ত হ'য়ে।

সম্পাদক সাহেব এই সময় তার নাকের ডগায় হাত বুলোতে বুলোতে বললো—এই দেখুন ! ছেলেবেলায় একবার বসন্ত হয়েছিল আমার ; সে দাগ এখনও মিলায় নি !

মিগনন বললো—তা হ'লে তো আপনার কোনই ভয় নেই। শুনেছি, একবার যার বসন্ত হ'য়ে গেছে, তাকে আর দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে না এ রোগ। আপনি তা হ'লে স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন নানার ঘরে।

সম্পাদক বললো—এটা একেবারেই বাজে কথা। একথা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না।

এই সময় রাজপথে আর একদল লোককে ছুটতে দেখা গেল। তাদেরও মুখে ঐ একই স্লোগান—"চলো বার্লিন।"

মিগনন টিপ্পনি কেটে বললো—হ্যাঁ, যাও না! বার্লিন গেলে আর পৈতৃক প্রাণটা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারবে না বাছাধনরা!

মিগননের এই মন্তব্য শুনে ফন্টান হঠাৎ রেগে উঠে বললো—কি বাজে কথা বকছো তুমি! দেশের জন্য যুদ্ধ করতে প্রত্যেকের যাওয়া উচিত।

লুসি এই সময় ফন্টানকে বললো—চলো না, সবাই মিলে নানাকে দেখে আসা যাক।

ফন্টান বললো—ওরে বাবা! আমি বরং যুদ্ধ করে প্রাণ দিতে রাজী আছি, কিন্তু বসন্ত হ'য়ে মরতে মোটেই রাজী নই।

ওদের যখন এইসব কথাবার্তা হচ্ছে, ঠিক সেইসময় একটি লোককে দেখা গেল রাস্তার অন্য দিকে একখানা বেঞ্চের উপর বসে থাকতে। লোকটি গালে হাত দিয়ে মাথা নীচু করে বসে ছিল, আর মাঝে মাঝে হোটেলের উপরতলার দিকে তাকাচ্ছিল।

ফন্টান বললো—আরে আরে! কাউন্ট মাফাত্ না ওটা? দ্যাখো তো সম্পাদক!

সম্পাদক তখন লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখে বললো—তাই তো! কাউন্ট মাফাত্ই তো!

এই সময় কাউন্টকে বেঞ্চ থেকে উঠে হোটেলের দিকে আসতে দেখা গেল।

একজন চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি—নানা এখন কেমন আছে বলতে পারো?

—এইমাত্র মারা গেল সে। চাকরটি খবর দিল।

নানা নেই!

খবরটা যেন সবার কাছেই একটা প্রচণ্ড আঘাতের মত মনে হ'লো। কাউণ্ট মাফাতের মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হ'লো না। তিনি যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই নিঃশব্দে ফিরে গিয়ে আবার সেই বেঞ্চখানার উপর বসে পড়লেন।

লুসি বললো—তোমরা না যাও তো আমি একাই চললুম।

লুসি রওনা দিতেই সেই খুদে দলটিও অনুসরণ করলো তাকে।

*　　*　　*

গ্র্যাণ্ড হোটেলের ৪০১নং কামরা।

একখানা খাটের উপর শোয়ানো রয়েছে নানার মৃতদেহ।

রোজি একটা মোমবাতি জ্বেলে নানার মাথার কাছে রেখে দরজার দিকে তাকাতেই দেখলো যে, একদল লোক তখন সেই ঘরে ঢুকছে।

লুসিই প্রথমে কথা বললো—মশারিটা তুলে ধর না' রোজি?

রোজি মশারিটা তুলে ধরতেই লুসি ভয়ে চীৎকার করে উঠলো। লুসির চীৎকার শুনে সবাই মিলে এগিয়ে গেলো খাটের কাছে, কিন্তু এগিয়ে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলো, তাতে সবাই ভয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল।

নানার মুখখানা এমনভাবে বিকৃত হ'য়ে গিয়েছিল যে, দেখলেই ভয় হয়। একটি চোখ গলে গিয়েছিল। বসন্তের অজস্র ক্ষত থেকে পূঁজ গড়িয়ে পড়ছিল তার সেই বিকৃত মুখে। নানার সেই সুন্দর নাকটি থেঁতলে গিয়েছিল। পচা আপেলের মত ওর গালের মাংসগুলো ঠেলে বেরিয়ে পড়েছিল।

রতিদেবী ভেনাস সেজে একদিন যে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতো, যার মুখের একটুকরো হাসি, চোখের একটু চটুল চাউনি, আর মুখের কথা শোনবার জন্য সারা প্যারীর শৌখিন পুরুষরা তাদের যথাসর্বস্ব ঢেলে দিতেও কুণ্ঠিত ছিল না তার পায়ে, আজ তার এ কী ভয়াবহ পরিণতি !

সুন্দরী ভেনাস আজ পচছে !

Venus was decomposing !

—শেষ—